দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖৫ সংখ্যা ❖১৭ জুলাই ২০২৬

সোনম ওয়াংচুক

➲ এই সংখ্যায় থাকছে

প্রবন্ধ
- পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর 'ভারত-ভাবনা'ই আর এস এস এর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য — মনিরুল হক — ৩
- ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি — শুভ বসু — ৫
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বে: উন্নয়নের নতুন ভাবনা — সৌর বসু — ৮

জাতীয় সংবাদ
- শিক্ষাসংস্কার ও লাদাখের পরিবেশ রক্ষার দাবিতে সোনম ওয়াংচুক ও ছাত্রদের অনশন — অপর্ণা চক্রবর্তী — ৯
- রামের নামে ভোটের পর রামের নামে লুঠ সঙ্ঘ পরিবারের মুখ থেকে মুখোশ — অমিতাভ সিংহ — ১০

রাজ্য সংবাদ
- বারুইপুরের 'অপরাজিতা' গণধর্ষণ ও হত্যা; একটি প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট — শুভ প্রতিম — ১২
- বারুইপুর এনকাউন্টার: আইন নয়, জঙ্গলের শাসন ; সুজাত ভদ্রের তীব্র নিন্দা — ১৬
- সঙ্ঘ পরিবার ও নেতাজি — শুভ মিত্র — ১৭
- তহমীনা খাতুন স্মারক বক্তৃতা : উচ্ছেদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক উচ্ছেদ — অপর্ণা চক্রবর্তী — ১৮
- রাস্তার নাম বদল ও ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা — সুশান্ত দাশগুপ্ত — ১৯

স্মরণ
- তিজন বাঈ — ২১
- সুমিতা দে — ২২

নাগরিক স্মৃতিচারণা
- ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ — আহমেদ ইশতিয়াক — ২৩

পুস্তক পর্যালোচনা
- বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা — বাসু আচার্য্য — ২৪

বিশেষ ক্রোড়পত্র
- বন্ধুতার পাতা সংকলক শুভেন্দু দাশগুপ্ত (পত্রিকার শেষ চারপাতা)

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

সম্পাদকীয়

আনন্দ সংবাদ! পশ্চিমবঙ্গে এতদিনে রামরাজত্বের সূচনা হয়েছে

বারুইপুরে এগারো বছরের একটি মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় ধৃত তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। মধ্যরাতে 'ঘটনার পুনর্নির্মাণ' চলাকালীন পুলিশের রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশকে গুলি করে পালাতে গেলে প্রধান অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল পুলিশের গুলিতে নিহত হন। দুটো গুলি লেগেছিল তাঁর পিঠে। পুলিশের ভাষ্য চেনা ছকে বাঁধা; অভিযুক্ত নাকি এক পুলিশকর্মীর আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল, পুলিশ 'আত্মরক্ষায়' গুলি চালায়, হাসপাতালে অভিযুক্তকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু নতুন নয়, লক আপে পিটিয়ে মারা, আত্মহত্যা, অসুস্থতার গল্প; এসব এ রাজ্য বহু দেখেছে। কিন্তু ঘোষিত, প্রকাশ্য, প্রায় উদযাপিত 'এনকাউন্টার', যেখানে রাষ্ট্র নিজেই ফলাও করে ঘোষণা করছে, সে 'বিচারের আগেই দণ্ড' কার্যকর করেছে; এই প্রথম। এবং এইখানেই বিপদের শুরু।

নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ধর্ষণে অভিযুক্তদের দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার অপেক্ষায় রাখা হবে না। বারুইপুরের ঘটনার পর তিনি বলেন, এই ঘটনায় কোনো অপরাধীকে রেয়াত করা হবে না। তিনি বারুইপুরে গিয়ে রাজ্যের ডিজিপিকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তদন্তে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির নির্দেশ দেন এবং তদন্তে পুলিশের কোনো গাফিলতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটে যায় প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারে মৃত্যু।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন, 'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো'। আর আজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন কায়েম করার জন্য উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ আর অসমের মখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে আদর্শ মনে করছেন। বলাইবাহুল্য মানবাধিকার লঙ্ঘণ আর সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণে তাঁরা গোটা দেশজুড়ে ধিকৃত।

আবার প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টার হত্যাকে সমর্থন করে যেমন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত সংবাদ মাধ্যম উর্ধ্ববাহু হয়ে ধন্যধন্য করছে, কেমনি সাধারণ মানুষও ধর্ষকের এই তাৎক্ষণিক বিচারে বেজায় খুশি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংশায় পঞ্চমুখ। মানুষ ভাবলোই না যে, প্রভাস মণ্ডল প্রকৃত ধর্ষক কিনা তা এখনও প্রমাণিত নয়। আবার সিপিএম নেতা এবং গত বিধানসভা নির্বাচনে বারুইপুর প্রার্থী লাহেক আলির গ্রেফতার আরেকটা অদ্ভুত ঘটনা। লাহেক আলির অপরাধ, তিনি বারুইপুরের নির্যাতিতা নাবালিকার গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে চাপা পড়তে দেননি। ওই ঘটনা ধামচাপা দেওয়ার সরকারি চেষ্টা এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে থানা ঘেরাও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অভিযুক্তদের পালাতে সাহায্য করার বিষয়ে বিজেপির স্থানীয় নেতার ভূমিকার কথাটা প্রকাশ্যে এনেছিলেন। বিজেপিকে যারা চেনেন তারা জানেন, বিজেপি প্রতিবাদের এই দুঃসাহস মেনে নেয় না।

ইতিমধ্যে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর এনকাউন্টার সংস্কৃতির অনুসারি ঔপনিবেশিক যুগের একটা আইন চালু করে দিয়েছেন রাজ্যে। রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বলবৎ হয়েছে 'গুন্ডা দমন আইন'; যার কেতাবি নাম 'পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬'। নতুন গুন্ডা দমন আইনে পুলিশকে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কার্যকলাপ যদি জনমনে আতঙ্ক তৈরি করে, তবে স্রেফ সন্দেহের বশে আদালতের বিচার ছাড়াই তাঁকে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত আটকে রাখতে পারবে প্রশাসন। পাশাপাশি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মতো কড়া ধারাও যুক্ত রয়েছে এতে। রাজ্য সরকারের দাবি, সংগঠিত অপরাধ ও সিন্ডিকেট রাজ রুখতে এই কড়া দাওয়াই প্রয়োজন ছিল। তবে বামপন্থীরা এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনগুলির একাংশ একে 'কালা কানুন' আখ্যা দিয়ে সরব হয়েছে।

আইনটি চালু হওয়ার প্রথম দিনেই তার সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মানবাধিকার কর্মীরা। মানবাধিরার সংগঠন এবং আইনজীবীদের বক্তব্য, এই আইন আসলে একটা ঔপনিবেশিক আইনের প্রয়োগ নতুন রূপে। ১৯২৩ সালে ইংরেজ আমলে 'ক্যালকাটা গুন্ডা অ্যাক্ট' চালু ছিল। প্রায় একশো বছর পরে আজ একই কায়দায় 'গুন্ডা' খুঁজে বের করার আইন তৈরি হল। আইনে 'গুন্ডা' শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা অস্পষ্ট। কোনও নির্দিষ্ট অপরাধীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট স্ট্যাটিউট ছাড়া এই ধরনের আইন রাখা সংবিধানের পরিপন্থী। এর ফলে রাষ্ট্রের হাতে এমন এক স্বৈরাচারী ক্ষমতা থাকছে, যা দিয়ে যেকোনও সময়, যেকোনও নাগরিকের বিরুদ্ধে এই আইনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। দেশের সংবিধান রাষ্ট্রকে এই ধরনের কোনও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেয় না। সবচেয়ে মারাত্মক হল, ভারতীয় সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে যেকোনও নাগরিকের আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়ার এবং আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই আইন মানুষের সেই মৌলিক অধিকারকেই লঘু করছে বা অস্বীকার করছে।

নিট-বিতর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে গত ২০ জুন থেকে দিল্লিতে যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে 'ককরোচ' দল। প্রথম থেকেই তাদের এই আন্দোলনে পাশে ছিলন লাদাখিদের স্বাধিকার দাবির প্রধান মুখ সোনম ওয়াংচুক। পরে ঘোষণা করেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি ২৭ জুনের মধ্যে কোনও জবাব না দেয় তবে অনশনে বসবেন তিনি। কেন্দ্রের কাছে প্রত্যাশিত কোনও উত্তর না মেলায় ২৮ জুন থেকে অনশন শুরু করেছিলেন লাদাখের এই সমাজকর্মী। সরকারের তরফে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি তাঁর সঙ্গে। বিরোধী দল মৌখিকভাবে তাঁর পাশে দাঁড়ালেও বড় কোনও নেতাকে অনশন মঞ্চের ধারেকাছে দেখা যায়নি। খোঁজ নেই কংগ্রেসেরও। এদিকে আবার ককরোচ জনতা পার্টির নেতাদের কাউকেই অনশনে বসতে দেখা যায়নি। তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝা উচিত ছিল এদেশে কোনও গণতান্ত্রিক সরকারের শাসন নেই, যেখানে অনশন বা সত্যাগ্রহকে সবার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যাঁকে বিচলিত করার জন্য তাঁর এই অনশন তিনি কার্যত একজন স্বৈরশাসক। এ দেশের প্রধামন্ত্রী দুবেলা পোশাক পাল্টে সেজেগুজে ঘুরে বেড়ান, আর নানাবিধ প্রবচন দেন। তিনি দেশবাসীর মৌলিক অধিকারের ধার ধারেন না। একজন সোনম ওয়াংচুক অনশন করে মারা গেলে একটা নাছোড় ঝঞ্ঝাট চিরতরে যায়; তাঁকে বিনাবিচারে জয়পুরের গারদে আটকে রেখেও দমানো যায়নি। এবার যদি তাঁদের বিপদটা কাটে; কেন্দ্রের সরকার কি সেরকমই কিছু চাইছে!

একজন সোনম ওয়াংচুককে হারালে ভারতের যে ক্ষতি হবে ধর্মেন্দ্র প্রধান-সহ গোটা মন্ত্রিসভা চলে গেলেও তার কুড়িভাগের এক ভাগও পূরণ হবে না।

প্রবন্ধ

পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর 'ভারত-ভাবনা'ই আরএসএস এর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য

মনিরুল হক

বহু হাজার বছরের উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, উন্নতি-অবনতির মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ ভারতের যে অবয়ব ও অন্তরাত্মা গড়ে উঠেছে তাকে নস্যাৎ করে, পুরোপুরি ধ্বংস করে, কর্পোরেট পুঁজির সহায়তায় একবগ্গা হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনের যে প্রকল্প আর এস এস বহুদিন আগে নিয়েছে, বর্তমানে সেই প্রকল্পের প্রধান মুখ হচ্ছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। কি দলে, কি দেশে, কি বিদেশে তাঁর একটা 'Larger than Life' ইমেজ গড়ে তুলতে আর.এস.এস বিজেপি ও অনুগত Lapdog মিডিয়া, সরকারী আধিকারিক এবং আমলা-কামলাদের একটি অংশ বহুদিন ধরেই একটি সুপরিকল্পিত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা সাধু-সন্তের রূপ ধরে আবির্ভুত হচ্ছেন এবং নরেন্দ্র মোদিকে 'বড়' করতে গিয়ে আমাদের পরীক্ষিত জাতীয় নেতাদের 'ছোট' করার সহজ পথটাই অনুসরণ করে চলেছেন। মহাত্মা গান্ধীকে ছোট করার জন্য তারা কখনও সরদার প্যাটেল ও কখনও সাভারকরকে তাঁর সমান করে দেখাচ্ছেন। নেতাজিকে ছোট করার জন্য শ্যামাপ্রসাদকে, যিনি আদৌ কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী নন, নেতাজির থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ রূপে তুলে ধরছেন। আর খোদ মোদীজীকে মহামানব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের কাছে সহজতম পথ হল অবিসংবাদিত জাতীয় নেতা, বিশ্ববন্দিত রাজনীতিবিদ জওহরলাল নেহরুকে ছোট করে দেওয়া। প্রেরণা পেয়েছেন সম্ভবত নীতিশিক্ষামূলক গল্পের সেই সাধুর থেকে, যিনি ইঁদুরকে বাঘে পরিণত করেছিলেন!

তাঁর সময়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রভাব জনমানসে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। আবার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও জনগণের একাংশের থেকে বিপুল সমর্থন পাচ্ছেন। সে কারণে দুজনকে নিয়ে তুল্যমূল্য আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে দুজন দুটি আলাদা সময়কালে জন্মেছেন; দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে দায়িত্ব সামলেছেন/ সামলাচ্ছেন। তাঁদের মতাদর্শও সম্পূর্ণ পৃথক।

পরাধীন দেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া এবং তারপর সদ্যস্বাধীন দেশের চরম দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা, অতি অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিকাঠামোর অভাব, বহুমাত্রিক জাতি গঠন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মুখোমুখি হওয়া এবং সর্বোপরি সমৃদ্ধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার মত দুরূহ কাজগুলি অতীব যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন জওহলরলাল নেহরু। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ, ভারী শিল্প স্থাপন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়- আই আই টি স্থাপন , গ্রামীণ এলাকার হাসপাতাল থেকে শুরু করে এইমস গঠন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সূচনার মত দিকনির্দেশনামূলক কাজকর্ম তাঁর হাতেই শুরু হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিশ্ব রাজনীতিতেও স্বমহিমায় ভাস্বর ছিলেন জওহরলাল। দুই মহা শক্তিধর জোটের বাইরে অবস্থান করে আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে নিয়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলা ও তার নেতৃত্ব দেওয়ার কাজও তিনি অতীব যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। অপরদিকে নরেন্দ্র মোদী যখন ক্ষমতায় আসেন তখন দেশে অবারিত পুঁজির অবারিত যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। শোষনের মাত্রা বহুগুণ বেড়েছে। একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য দুর্বার গতিতে এগোচ্ছে। ধনী দরিদ্রের ফারাক হু হু করে বাড়ছে। জাতীয় সম্পদ নাম-কে-ওয়াস্তে দামে বিক্রী করে দেওয়া হচ্ছে নিজেদের সখের শিল্পপতিদের। সংখ্যালঘু মানুষের উপর নির্যাতন লাগামছাড়া হয়েছে। সরকার এবং সরকারী দল সমস্ত আইন ও নিয়ম-নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে এসব কাজে মদত দিচ্ছে। দুর্নীতি চরমে উঠেছে। নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থার মত নিরপেক্ষ ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গুলিকে সরকারের আজ্ঞাবহ করে তোলা হয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল বিষিয়ে উঠেছে। উদার গণতন্ত্রের দেশকে৮ একদলীয়, Majoritarian (সংখ্যাগরিষ্ঠ) গোষ্ঠির কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে আনার প্রয়াস চলছে। উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে তথাকথিত শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের অঙ্গুলি হেলনে। পরিমাণগতভাবে দেশে আগের থেকে বেশি সম্পদ সৃষ্টি হলেও তার মালিকানা চলে যাচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। নীচতলার মানুষের জন্য বরাদ্দ থাকছে দান-রিলিফ-লোনের ব্যবস্থা। ফলে পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে সমৃদ্ধির ইঙ্গিত থাকলেও অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বিবেচনায় দেশের অবস্থা উদ্বেগজনক। আর বৈদেশিক নীতির কথা না বলাই ভালো। কি আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলির কাছে, কি বাকি বিশ্বের কছে ভারত আজ 'Untold and Unsung'।

তবে সম্ভবত একটা ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদী পন্ডিত নেহরুকে অনুসরণ করছেন। ভারতাত্মার অনুসন্ধান করতে গিয়ে নেহরু একবার বলেছিলেন, 'আমি যে শ্রেণীতে জন্মেছি তার প্রতি আমার কোনও শ্রদ্ধা বা অনুরাগ ছিল না'। আমরা জানি, কথিত 'সোনার চামচ' মুখে নিয়ে

জন্মালেও জওহরলাল সারাটা জীবন অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করে গেছেন। শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ দেখেছেন ,অপরপক্ষে নরেন্দ্র মোদী কথিত 'সাধারণ চা ওয়ালা' পরিবারে জন্মালেও নেহরুর আপ্তবাক্যকে মান্যতা দিয়ে বর্তমানে বৈভব ও আড়ম্বরের জীবন যাপন করছেন। অর্থাৎ দুজনেই নিজ নিজ শ্রেণির প্রতি অবিচার করেছেন ।

কিন্তু তবুও ধারে এবং ভারে নরেন্দ্র মোদী যে জওহরলাল নেহরুকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন এটা প্রমাণ করতেই হবে। তাই শিক্ষিত ভক্তবৃন্দ নতুন একটি ফর্মুলা আবিস্কার করেছেন। সেটি হল ৪৩৯৮+। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীত্বের মেয়াদের হিসাবে নরেন্দ্র মোদী পন্ডিত নেহরুর ৪৩৯৮ দিনের মেয়াদকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ভক্তবৃন্দ সম্ভবত জানেন না যে নেহরু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে। অর্থাৎ ১৭ বছর তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।তার আগে নেহরু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অবিসংবাদিত নেতা এবং শুধুমাত্র ইংরেজদের কারাগারেই তিনি জীবন কাটিয়েছেন ৩২৫৯ দিন। অর্থাৎ প্রায় ১০ বছর ।আর ক'দিন প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন এই পরিসংখ্যান দিয়ে যে জওহরলাল নেহরুর মতো মানুষকে পরিমাপ করা যায় না তা ভক্তকুল না জানলেও দেশের সাধারণ মানুষ জানেন। অবশ্য সাধারণ মানুষ এটাও জানেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা উঠলেই ভক্তকুল এবং তাঁদের গুরুজী ভয়ে এবং লজ্জায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

তবে নেহরুকে পর্যুদস্ত করতে ভক্তবৃন্দ শুধু পরিসংখ্যান বা ফর্মুলার উপরেই ভরসা করে বসে থাকেন নি। তাঁরা নেহরুর রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক এবং আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। নেহরু নাকি ভারতকে ঠিকমতো বুঝতে পারেন নি। ভারতবাসী কি চায় তা তিনি জানতেন না। ধর্মপ্রাণ ভারতীয় সমাজ ও ভারতীয় চেতনার সঙ্গে তিনি একাত্ম হতে পারেন নি। তিনি অন্যায়ভাবে ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গিই এসবের জন্য দায়ী।

জওহরলাল নেহরু শুধু রাজনীতি নয়, তিনি শিশুদের মনোজগৎ, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ,আইন ও দর্শনের মনযোগী ছাত্র ছিলেন। তাঁর জানার আগ্রহ ছিল অগাধ; পড়াশুনোর পরিধি ছিল ব্যাপক কিন্তু তিনি অনুধাবন করতেন নির্মোহ ভাবে, অযথা প্রভাবিত হতেন না। সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর মেলামেশা, কথোপকথন। তাঁর চিন্তা ভাবনাও ছিল সুদূরপ্রসারী। ভারতবর্ষের আদি মানুষ, আর্যদের আগমন, অন্যান্য বহিরাগত মানুষদের আগমন, এইসব মানুষদের শিক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম, পারস্পরিক সম্পর্ক, ঐক্য ও বিরোধ এসব বিশ্লেষন করে তাঁর মনে হয়েছিল বহুদিন ধরেই বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধনই ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের প্রধান শক্তি। এছাড়া ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র রক্ষা করা, সমস্ত মত ও পথকে মর্যাদা দেওয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠে অগ্রসর হওয়া, গরীব ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রভৃতিকেও তিনি সুস্থ ও উন্নতিকামী সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত বলে মনে করতেন।এই বিরাট দেশের ভৌগোলিক বৈচিত্রের মত মানুষের খাদ্য, ভাষা, পোশাক, ও পেশার বৈচিত্র্যকে সম্মান করা ও তাকে সুরক্ষা দেওয়াকেও তিনি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। আর এই সব বিষয়ের সামগ্রিক উপলব্ধির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল তাঁর ভারত ভাবনা। মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে কংগ্রেস দলের সবাই, আচার্য নরেন্দ্র দেব ও জয়প্রকাশ নারায়নের মত সোশালিষ্ট, সশস্ত্র সংগ্রামীরা, কমিউনিস্টরা সকলেই এই ভারত ভাবনার সাথে সহমত পোষন করতেন। ফলে স্বাধীনতা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক রূপরেখা তৈরি হয়েছিল এই ভারত ভাবনাকে কেন্দ্র করেই।

পন্ডিত নেহরু সংসদীয় গণতন্ত্রকে সেরা শাসন ব্যবস্থা বলে মনে করতেন এবং এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই তিনি অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন কাল থেকে আমাদের যা কিছু অর্জন, যা কিছু সঞ্চয়, যা কিছু সংস্কৃতি, যা কিছু ঐতিহ্য- তার সবকিছুর এক আন্তরিক সমন্বয়। ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল এই যে, সব ধর্মের মানুষের অধিকার সমান হবে, সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে। ধর্মাচরণের অধিকার প্রত্যেক ভারতবাসীর থাকবে কিন্তু রাষ্ট্র কোন ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখাবে না।রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ।

দারিদ্র, শিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন জীবনের দিকে, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা একান্ত আবশ্যক।

আসলে তিনি চাইতেন ধর্মনিরপেক্ষ, আধুনিক কিন্তু ইউরোপের অনুকরণে নয়, বৈচিত্র্যময় কিন্তু অখন্ড এক গণতান্ত্রিক জাতি রাষ্ট্র। বস্তুত আমাদের দেশের যে সংবিধান তা বহুলাংশে জওহরলাল নেহরুর ভারত-ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু আর এস এস ভারতবর্ষকে যে ভাবে দেখতে চায় তা বর্তমান সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে তারা পন্ডিত জওহরলাল নেহরুকেই তাদের প্রধান শত্রু বলে মনে করবে।

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

শুভ বসু

ভারতবর্ষ শব্দটির ব্যঞ্জনা অনেক। তার ঐতিহাসিক সূত্র ধরে এই ধারণার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে নানা বিতর্ক হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। ভারত, ইন্ডিয়া , হিন্দুস্তান প্রতিটি শব্দর ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা রয়েছে এবং ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে যুক্ত। সেই সঙ্গে রয়েছে শ্রেণী ব্যঞ্জনা , ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা এবং ভাষা এবং ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের সঙ্গে যুক্ত। ভারত একটি অনুসন্ধান, বিভিন্ন সভ্যতার , জাতি সত্ত্বার, ধর্মর এবং বর্ণর মানুষের এক সহাবস্থান এবং সংমিশ্রণ। ভারতের একতার ক্ষেত্রে কাশ্মীর এবং উত্তরপূর্ব ভারতের কিছু রাজ্য বাদ দিলে সবাই গণতান্ত্রিক , সাংবিধানিক কাঠামো কে মেনে নিয়েছেন এবং তার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় পরিচিতি বোধের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন।

ভারতের আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিবর্তন হয় ঔপনিবেশিক শাসনে। ভারতের ধর্মীয় প্রশ্নের সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে যুক্ত তা হলো নারী প্রশ্ন। বিবাহ উত্তরাধিকার, সম্পত্তির উপর অধিকার বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে নারীরই ভরণ পোষণের বিষয় মানে আমাদের বৌ, মেয়ে বোন মা মাসিদের নিবিড় সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত । উপনিবেশিক শাসনে ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী গুলির মানে হিন্দু মুসলমান পারসী এবং খ্রিস্টানদের আলাদা ধর্মীয় আইন ছিল। হিন্দু আইনের আওতায় শিখ জৈন এবং বৌদ্ধ সমাজকে নিয়ে আসা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আপাত দৃষ্টিতে নারী প্রশ্নে হিন্দুরা তাদের মুসলমান পড়শিদের থেকে পিছিয়ে ছিলেন। মুসলমানরা শুধু চারটে বিবাহ করতে পারতেন হিন্দু পুরুষরা উত্তরাখণ্ডের বিশেষ অঞ্চল বাদ দিলে বহুবিবাহ মানে কুলীন ব্রাহ্মণ পুরুষরা তিরিশ চল্লিশটা বিয়ে করতেন। হিন্দু দের মধ্যে সতীদাহ চালু ছিল মুসলমানদের মধ্যে ছিল না। হিন্দুদের বিধবারা বিবাহ করতে পারতেন না মুসলমানরা বিবাহ করতে পারতেন। আর পর্দা প্রথার প্রকোপ, বাল্য বিবাহ উভয় সমাজে প্রবল ভাবে ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর , জ্যোতিবা ফুলে, নারায়াণ গুরু এবং পন্ডিতা রমাবাই , সাবিত্রীবাঈ ফুলে, তারাবাই শিন্ডে, রমাবাই রানাডে, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রমুখ সমাজ নারীবাদী সমাজ সংস্কারকরা ভারতের নারী প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কে যোগ দিয়ে নারী প্রশ্ন কে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের দিশা পরিবর্তনের প্রয়াসী হন। সেই সময় মুসলমান সমাজে নারী প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা তৈরী হয়। মহারাষ্ট্রের ফাতিমা শেখ ভারতের প্রথম মুসলিম মহিলা শিক্ষিকা হিসেবে পরিচিত।

১৮৪৮ সালে তিনি জ্যোতিরাও এবং সাবিত্রীবাঈ ফুলের সাথে পুনেতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমাজের তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে প্রান্তিক দলিত, আদিবাসী এবং সকল ধর্মের মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। নবাব শাহজাহান বেগম (১৮৩৮-১৯০১) ও নবাব সুলতান জাহান বেগম (১৮৫৮-১৯৩০ভোপাল রাজকীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্রী মা-মেয়ে বেগম। তাঁরা ছিলেন দূরদর্শী সংস্কারক, যাঁরা মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছিলেন, মহিলা হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন এবং ভারতজুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থায়ন করেছিলেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) যদিও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁর প্রধান কর্মকাণ্ড তুঙ্গে উঠেছিল, তাঁর মৌলিক লেখা এবং অবরোধ প্রথার সমালোচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। তিনি কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙালি মুসলমান সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন।

প্রসঙ্গত যে এই সময়ে অটোমান সাম্রাজ্যে আরব দুনিয়াতে এবং ভারতের পার্শবর্তী ইরানে মুসলমান সমাজে নারী প্রশ্ন নিয়ে চিন্তার আলোড়ন ওঠে। ফাতমা আলিয়ে হানিম (১৮৬২-১৯৩৬) উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকদের একজন এবং সম্ভবত সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রাথমিক মুসলিম নারীবাদী বুদ্ধিজীবী। তিনি নারীদের জন্য কাঠামোগত শিক্ষাগত উন্নতির পক্ষে কথা বলতে ১৮৯৫ সাল থেকে প্রকাশিত অগ্রণী নারী সাময়িকী ‘হানিমলারা মাহসুস গেজেট’-এ তাঁর কলাম ব্যবহার করতেন। তাঁর ১৮৯৬ সালের রচনা ‘নিসভান-ই ইসলাম’ (‘ইসলামের নারী’)-এ আলিয়ে ইউরোপীয় ভুল ধারণার বিরোধিতা করে একটি ইসলামী কাঠামোর মধ্যে নারী মুক্তির পক্ষে যুক্তি দেন। এমিনে সেমিয়ে (১৮৬৪-১৯৪৪): ফাতমা আলিয়ের বোন, তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কর্মী। তিনি উসমানীয় নাগরিক পরিচয় নির্মাণে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে নারী নাগরিক অংশগ্রহণ, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা এবং নারী ভোটাধিকারের প্রয়োজনীয়তার উপর ব্যাপকভাবে লিখেছেন। উসমানীয় সংস্কারের সমান্তরালে, আরব নবজাগরণ (নাহদা) মুদ্রণযন্ত্র, সাহিত্যিক আসরের দ্রুত বিকাশ এবং তারবিয়া (নৈতিক শিক্ষা/সন্তান লালন-পালন) ও লিঙ্গীয় গণতন্ত্রায়নকে ঘিরে এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। হিন্দ

নওফল (১৮৬০-১৯২০) একজন অগ্রণী সাংবাদিক যিনি ১৮৯২ সালে আরব বিশ্বে প্রথম নারীদের পত্রিকা 'আল-ফাতাত' (তরুণী) প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকাশনাটি নারীদের বিবাহ, নারী শিক্ষা এবং সমাজে তাদের ক্রমবিকাশমান ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের জন্য একটি মঞ্চ প্রদান করেছিল।

জয়নাব ফাওয়াজ (আনুমানিক ১৮৬০–১৯১৪): একজন লেবানিজ-মিশরীয় লেখিকা ও নারীবাদী যিনি শিক্ষা ও জনজীবনে নারীর স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আবেগপূর্ণভাবে লিখেছেন। তিনি উল্লেখযোগ্য নারীদের জীবনী নিয়ে বিখ্যাত অভিধান 'আল-দুরর আল-মানথুর ফি তাবাকাত রাব্বাত আল-খুদুর' (১৮৯৪) প্রকাশ করেন, যা সমসাময়িক নারীবাদী দাবিগুলোকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ইসলামী ও বিশ্ব ইতিহাস জুড়ে নারীদের ঐতিহাসিক সক্রিয়তাকে তুলে ধরে। মরিয়ম আল-নাহহাস উনিশ শতকের একজন আরব বুদ্ধিজীবী, যিনি আরব ও মুসলিম নারীদের প্রথম জীবনীমূলক অভিধানগুলোর অন্যতম 'মা'আরিদ আল-ফাদাইল' সংকলন করেন, যেখানে পূর্ববর্তী যুগের নারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব নথিভুক্ত করা হয়েছে।

তাহিরিহ কুররাত আল-আইন (১৮১৪-১৮৫২) একজন প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ, কবি এবং বাবীয় আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেত্রী ছিলেন। বলা যেতে পারে, তিনিই ছিলেন ইরানি নারী অধিকার আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের সবচেয়ে বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব। তিনি লিঙ্গীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমতার পক্ষে কথা বলতেন এবং প্রকাশ্যে তাঁর ঐতিহ্যবাহী পর্দা ত্যাগ করেন; যা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পারস্যে এক বিস্ময়কর ও অবাধ্যতার কাজ। তাঁর স্পষ্টভাষী সক্রিয়তা এবং কবিতা পরবর্তী প্রজন্মের নারী কর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণার এক স্থায়ী প্রতীক হয়ে ওঠে। বিবি খানুম আস্তারাবাদী (আনুমানিক ১৮৫৮-১৯২১) প্রায়শই আধুনিক ইরানি নারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত হন। তিনি ছিলেন একজন লেখিকা, ব্যঙ্গসাহিত্যিক এবং স্পষ্টভাষী নারীবাদী। পার্শবর্তী আফগানিস্তানে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাদশা আমানউল্লাহর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে নারী শিক্ষা এবং পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন। তার ঢেউ সামান্য হলেও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও এসে লেগেছিল।

স্বাধীন ভারতে আম্বেদকর এবং নেহেরু উদ্যোগী হন নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন পরিবর্তনে। ১৯৫০-এর দশকে হিন্দু মহাসভা এবং ভারতীয় জন সংঘ সহ হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলি হিন্দু কোড বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। তারা বি. আর. আম্বেদকর প্রবর্তিত এই প্রগতিশীল আইনটিকে ক্ষতিকর বলে মনে করত। বিবাহ, সম্পত্তি এবং বিবাহবিচ্ছেদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আম্বেদকরের পদক্ষেপকে ধর্মীয় ঐতিহ্যে রাষ্ট্রের অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং হিন্দু সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উপর আক্রমণ হিসেবে দেখা হয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মূল যুক্তি ছিল যে হিন্দু আইনকে বিধিবদ্ধ করা ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে এবং গোঁড়া হিন্দুধর্মের মূল নীতি থেকে বিচ্যুত করে।

১৯৫০-এর দশকে জন সংঘ এবং সহযোগী ঐতিহ্যবাদীরা ইউসিসির দাবিকে একটি বিলম্বিত কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তারা যুক্তি দিয়েছিল যে সংখ্যালঘুদের ব্যক্তিগত আইন অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র হিন্দু আইনের সংস্কার করা বৈষম্যমূলক। ঐতিহ্যের প্রতি হুমকি: প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো; যা একবিবাহ প্রথা চালু করেছিল, কন্যাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার দিয়েছিল এবং বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছিল; রক্ষণশীল হিন্দু আইনপ্রণেতাদের দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছিল, যারা এগুলোকে ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার কাঠামোর অস্থিতিশীলকারী হিসেবে দেখেছিলেন। আইন প্রণয়নের ফলাফল গোঁড়াদের অবিরাম প্রতিরোধের কারণে এবং জাতীয়তাবাদী সদস্যদের কারণে, আম্বেদকরের খসড়া করা মূল, ব্যাপক হিন্দু কোড বিলটি প্রাথমিকভাবে পরাজিত হয়েছিল।

বিলটিকে চারটি পৃথক, কিছুটা শিথিল আইনে বিভক্ত করার পরেই অবশেষে ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে সেগুলি পাস হয়েছিলঙ্খ বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৪): ধর্মীয় ভেদাভেদ নির্বিশেষে নাগরিক বিবাহের জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫): বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের আইন সংহিতাবদ্ধ করে, একবিবাহ প্রথা প্রবর্তন করে এবং বিবাহের উপর জাতিভিত্তিক বিধিনিষেধ বাতিল করে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬): হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ ও মালিকানার যথেষ্ট অধিকার প্রদান করে। হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইন (১৯৫৬): দত্তক আইনকে প্রমিত করে এবং নির্ভরশীলদের জন্য ভরণপোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সে যুগে সঠিকভাবেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ , হিন্দু মহাসভা জনসঙ্ঘ প্রভৃতি দল গুলিকে প্রগতির অন্তরায় বলে ভারতের অধিকাংশ মানুষ মনে করতেন। ফলে তাঁরা তাঁদের কে বর্জন করেছিলেন। নেহেরু এবং আম্বেদকর দেশ ভাগ জনিত আঘাতের জন্যে এবং মুসলমান সমাজের সে যুগের নাজুক অবস্থা ভেবে একক দেওয়ানি বিধি প্রচলন করেননি।

পাকিস্তানে আইয়ুব খান নারী সংস্কার সংক্রান্ত ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে জারি মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ (এমএফএলও)-জারি

করেছিলেন । বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রণীত এই অধ্যাদেশটি ছিল মুসলিম ব্যক্তিগত আইনকে বিধিবদ্ধ করার প্রথম বড় প্রচেষ্টা এবং এটি বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছিল। অধ্যাদেশটির মূল বিধানগুলোর মধ্যে রয়েছে, বহুবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা, একজন স্বামীকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের জন্য একটি সালিশি পরিষদ এবং তার বর্তমান স্ত্রীর কাছ থেকে পূর্ব লিখিত অনুমতি নিতে হবে। অননুমোদিত বহুবিবাহে আবদ্ধ হলে স্বামীকে অবিলম্বে সম্পূর্ণ দেনমোহর (মাহর) প্রদান করতে হয় এবং কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

এই আইন অনুযায়ী, স্বামীকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে তালাকের লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হয় এবং তালাক কার্যকর হওয়ার আগে বাধ্যতামূলকভাবে ৯০ দিনের একটি মীমাংসার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আইন নারীর তালাক-এ-তাফউইজ (তালাকের অর্পিত অধিকার)-এর অধিকারকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে এবং স্ত্রীদের জন্য দেওয়ানি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করার পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। বিবাহের ন্যূনতম বয়স : এই আইন বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সংশোধন করে নারীদের বিবাহের আইনি বয়স ১৪ থেকে বাড়িয়ে ১৬ বছর করেছে। বাধ্যতামূলক নিবন্ধন:সকল মুসলিম বিবাহ অবশ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে, যা নারীদের আইনি বিরোধে বৈবাহিক মর্যাদা বা ভরণপোষণ থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। ভরণপোষণের অধিকার: স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত ভরণপোষণ নিশ্চিত করার জন্য একটি সালিশি পরিষদে আবেদন করার আইনি অধিকার লাভ করেছেন। কিন্তু পাকিস্তানে এর পরবর্তীকালে সিন্ধু নদী দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে এবং নিজাম এ মুস্তাফা জিয়া উল হকের সময়ে পাকিস্তান আবার নারী প্রশ্নে একান্তভাবে রক্ষণশীল আইন প্রণয়ন করেন। ইরানে এবং আফগানিস্তানে নারী অধিকার বর্তমানে অনেকাংশে ভুলুণ্ঠিত হয়েছে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা।

ভারতে বর্তমানে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলগুলি যাঁরা এক কালে হিন্দু কোড বিলের বিপক্ষে ছিল তারাই এখন নারীবাদী এবং বাম পন্থীদের দাবি করা একক দেওয়ানি বিধি নেই সোচ্চার হয়েছে কেন ? তার অনুসন্ধান খুঁজতে ১৯৮৫ সালে ফেরত যেতে হবে। সেই সময়ে শাহ বানু, একজন ৭৩ বছর বয়সী মুসলিম মহিলা, তাঁর স্বামীর দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত হন এবং ফৌজদারি কার্যবিধির (সিআরপিসি) ১২৫ ধারার অধীনে ভরণপোষণ দাবি করেন। এই ধারাটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ আইন যা অসহায় স্ত্রী, সন্তান এবং পিতামাতার ভরণপোষণ নিশ্চিত করে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তাঁর পক্ষে রায় দিয়েছিলো এবং জানিয়েছিল যে ১২৫ ধারা ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ভরণপোষণ প্রদান কুরআনে বর্ণিত প্রাক্তন স্ত্রীদের প্রতি কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই রায়ের ফলে রক্ষণশীল মুসলিম গোষ্ঠীগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়, যারা যুক্তি দিয়েছিল যে বিচার বিভাগ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন এবং শরিয়াতে হস্তক্ষেপ করছে। রাজনৈতিক পরিণতি এবং রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতাদের চাপের ভয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীর সরকার এই রায়ের প্রতি তাদের প্রাথমিক সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য সরকার মুসলিম মহিলা (তালাকের অধিকার সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ পাস করে। এই আইনটি তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের ভরণপোষণের অধিকারকে মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এর মাধ্যমে কার্যকরভাবে বলা হয়েছিল যে, ধর্মনিরপেক্ষ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদী ভরণপোষণের পরিবর্তে, একজন স্বামীর তার প্রাক্তন স্ত্রীর প্রতি আর্থিক দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র ইদ্দতকালীন সময়ে (বিবাহবিচ্ছেদের পর তিন মাসের অপেক্ষার সময়) প্রযোজ্য হবে।

এই বিলটি প্রণয়নের ফলে নারী অধিকার সংগঠন, আইন বিশেষজ্ঞ এবং প্রগতিশীল সংস্কারকদের কাছ থেকে ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, যারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি রাজনৈতিক তোষণের জন্য মুসলিম নারীদের সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে আপস করেছে। এটি ভারতে একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি)-র প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কয়েক দশক ধরে চলা বিতর্কের একটি প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। আমি তখন বিশ্বভারতীতে ছাত্র ছিলাম। মূলত সেই সময়ের বিশ্বভারতী ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এই আইনের বিরোধিতা করার জন্যে আমরা সাংবাদিক বাহারুদ্দিন দা এবং সেই সময়ে মহিলা কর্মী হিসাবে ডাঃ মমতাজ সংঘমিতা চৌধুরী কে নিয়ে এসেছিলাম।

সেই থেকে চরম ডান পন্থী মহিলা আন্দোলনের বিরোধী শক্তি এখন কেন একক দেওয়ানি বিধি নিয়ে উদ্যোগী হয়েছে। তাদের ইসলামোফোবিয়া জানা ব্যাধি। তারা ভারতের তথা বাংলার বুক থেকে ইসলামের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে উদ্যত। কাজেই যাঁরা এ বিষয়ে ভালো জানেন তাঁরা এ বিষয়ে লিখুন। আমাদের কে জানান।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বে: উন্নয়নের নতুন ভাবনা

সৌর বসু

আমাদের দেশে ১৯৯১ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতির প্রবর্তন করেন। এই নীতির ফলে ভারতের অর্থনীতি নতুন গতিপথে এগোতে শুরু করে এবং দেশের জিডিপি (GDP) বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ভারতের বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হার গড়ে প্রায় ৩ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যা অর্থনীতিবিদদের ভাষায় 'হিন্দু রেট অব গ্রোথ' নামে পরিচিত। উদারীকরণের পর সেই চিত্র দ্রুত বদলাতে শুরু করে। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশেরও বেশি হয়েছে।

এই সাফল্যের ভিত্তিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। কিন্তু এই গর্বের আড়ালে দেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম আড়ালেই থেকে যায়। আমাদের দেশেও জিডিপি খুব উচ্চাহারে বৃদ্ধি পেলেও দেখা যাচ্ছে যে দেশের নাগরিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অস্বাভাবিক রকম বেশি। দেশের সম্পদের ৪০% এর উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে আমাদের দেশের মানুষের এক শতাংশ অন্যদিকে দেশের ১০ শতাংশ মানুষ ৬৫ শতাংশ সম্পদের অধিকারী। দেশে ৫০ শতাংশ মানুষ মোট সম্পদের মাত্র ১৫ শতাংশের উপর মালিকানা বজায় রেখেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)এর বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায় ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনো পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত। এশিয়ার বাংলাদেশ, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশগুলিতে জিডিপি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি সামাজিক ক্ষেত্রগুলি অনুন্নত। পর্যাপ্ত যান চলাচলের পরিকাঠামোর অভাব উচ্চাহারে মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব দেশের অর্থনীতির উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করেছে।

বহু অর্থনীতিবিদের মতে, কেবল জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের সমানুপাতিক উন্নতি নিশ্চিত করে না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল যদি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে না পৌঁছায়, তবে সেই প্রবৃদ্ধির সাফল্য প্রশ্নের মুখে পড়ে।

শুধু ভারত বা এশিয়ার দেশগুলি নয়, সমগ্র বিশ্বেই আজ একই প্রশ্ন ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এবং সেই দেশগুলির দারিদ্র্যের চিত্র পাশাপাশি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকার ইথিওপিয়া, বেনিন, জিবুতি প্রভৃতি দেশেও জিডিপি বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য , কিন্তু সেই প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য দূরীকরণ বা সাধারণ মানুষের জীবনমানের প্রত্যাশিত উন্নতি ঘটাতে পারেনি। অর্থাৎ, জিডিপি বৃদ্ধি এবং মানবকল্যাণ এক জিনিস নয়।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যে অর্থনৈতিক সংকট এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিটজ, জয়তী ঘোষ, টমাস পিকেটি, অলিভিয়ার ডি শুটারসহ বহু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং তৃণমূল স্তরে কর্মরত গণতান্ত্রিক ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মীদের সহযোগিতায় একটি বিকল্প কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা জিডিপি বৃদ্ধিকে উন্নয়নের প্রধান সূচক হিসেবে ধরে নিলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়, এমন একটি বিকল্প উন্নয়ন-দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান জানিয়েছেন, যার কেন্দ্রে থাকবে মানুষের কল্যাণ, সামাজিক ন্যায় এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আমরা আজ এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে অভাব অনেকাংশেই কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীতে সম্পদের অভাব নেই; বরং এটি ইতিহাসের অন্যতম সমৃদ্ধ সময়। তবু বিশ্বের প্রায় এক-দশমাংশ মানুষ এখনও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। তাদের নিরাপদ বাসস্থান নেই, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব রয়েছে, শিক্ষার সুযোগ সীমিত এবং মৌলিক স্বাস্থ্যসেবাও তাদের নাগালের বাইরে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র একটি ধনী গোষ্ঠী বিশ্বের বিপুল সম্পদ ও ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে।

এই বৈষম্যের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন, খরা, দাবানল, বন্যা এবং পরিবেশগত বিপর্যয় বিশ্বজুড়ে মানুষের জীবনকে আরও অনিশ্চিত করে তুলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং একটি ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক মডেলের প্রত্যক্ষ ফল। দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যও কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়; এগুলি নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলাফল। সরকারি নীতি কী উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, করব্যবস্থা কীভাবে গড়ে তোলা হয়, শ্রমবাজার কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং নীতিনির্ধারণের সময় কার মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়;এসব বিষয়ই নির্ধারণ করে উন্নয়নের সুফল কারা ভোগ করবে। তাই বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, যদি নীতির মাধ্যমে দারিদ্র্য সৃষ্টি করা যায়, তবে সঠিক নীতির মাধ্যমেই তা নির্মূল করাও সম্ভব।

গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে যে প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য ছিল জিডিপি বৃদ্ধি। ধারণা করা হয়েছিল, অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণের সুফল একসময় সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে যাবে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা সেই প্রত্যাশাকে সমর্থন করেনি। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেও আয়ের বৈষম্য বেড়েছে, সম্পদ ক্রমশ অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, অথচ সাধারণ মানুষের মজুরি তেমন বাড়েনি, কর্মসংস্থানের সংকট রয়ে গেছে এবং মানসম্মত সরকারি পরিষেবাও অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। একই সঙ্গে পৃথিবী ক্রমশ একটি 'হটহাউস আর্থ'-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের ক্রমবর্ধমান নির্গমন এবং জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় পৃথিবীকে বসবাসের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। বিশ্বের মোট কার্বন নির্গমনের বড় অংশের জন্য উচ্চ আয়ের দেশ ও ধনী জনগোষ্ঠী দায়ী, অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে মারাত্মক মূল্য দিতে হচ্ছে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের। তাদের কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীবিকা আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য স্পষ্ট;অবিরাম জিডিপি প্রবৃদ্ধিকেই উন্নয়নের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে দেখার অর্থনৈতিক মডেল শুধু অপর্যাপ্ত নয়, অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনকও। আজকের মূল প্রশ্ন প্রবৃদ্ধি হবে কি হবে না, তা নয়; বরং কী ধরনের অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হবে, যা প্রত্যেক মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবন, সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করতে পারে।

এই লক্ষ্যেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সংকীর্ণ ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের মৌলিক অধিকার, নিরাপদ জীবন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য নির্মূলকে কেন্দ্র করে একটি নতুন উন্নয়ন-রূপরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে। এই উদ্যোগে বিশ্বের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪০০ জন সামাজিক আন্দোলনের কর্মী, গবেষক ও নীতিনির্ধারক অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের অভিন্ন লক্ষ্য;সর্বোচ্চ উৎপাদন বা মুনাফা নয়, বরং মানুষের অধিকার, মর্যাদা এবং সার্বিক কল্যাণকে উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত সাফল্য কেবল জিডিপির পরিসংখ্যানে নয়; তার প্রকৃত মূল্যায়ন হবে এই প্রশ্নের উত্তরে;দেশের প্রতিটি মানুষ কি পর্যাপ্ত খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পরিবেশ এবং মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার সুযোগ পাচ্ছে? উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে যদি মানুষকে স্থাপন করা না যায়, তবে প্রবৃদ্ধির সমস্ত পরিসংখ্যান শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে পড়বে।

জাতীয় সংবাদ

শিক্ষাসংস্কার ও লাদাখের পরিবেশ রক্ষার দাবিতে সোনম ওয়াংচুক ও ছাত্রদের অনশন চলছে

অপর্ণা চক্রবর্তী

শিক্ষাবিদ, পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞানী সোনম ওয়াংচুকের অনির্দিষ্টকালের অনশন ১৭ দিন পেরলো। শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশার বিরুদ্ধে চলা এই অনশনে সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে যা সারা দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকের উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। গত ৩ মে সারা দেশে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা আয়োজক সংস্থা এনটিএ নিট (ইউজি) পরীক্ষা আয়োজনের পরেই প্রশ্ন ফাঁসের চক্র সামনে আসে এবং ১২ তারিখ নিট পরীক্ষা বাতিল হয়। এই ঘটনায় সারা দেশের শিক্ষামহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। লাখ লাখ ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালে। প্রায় ২০ জন ছাত্র ছাত্রীর আত্মহত্যার খবর সামনে আসে। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত গত ১৫ ই মে দেশের বেকার যুবক যুবতীদের আরশোলার সাথে তুলনার পর নবীন প্রজন্মের (জেন জি) দল ককক্রোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) আত্মপ্রকাশ করে এবং কেন্দ্রীয় শাসকদলের বিরুদ্ধে তাদের মতামত জোরালো হয়। আত্মপ্রকাশের পরপরই এই দল সোনম ওয়াংচুকের সমর্থন পায়। ৬ জুন দিল্লির রাজপথে হাজার হাজার যুবক যুবতী শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবী তোলে। এরপর ২০ জুন থেকে সিজেপি যন্তরমন্তরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধরনা শুরু করে। ২৮ জুন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পরিবেশ আন্দোলনকারী ও বিজ্ঞানী সোনম ওয়াংচুক ও ছজন ছাত্র অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে যোগ দেন। ২০১৭ সালে জাতীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা এনটিএ তৈরি হয়। গত কয়েক বছরে বারবার এই সংস্থার ব্যর্থতা সামনে এসেছে। নিট, নেট, সিইউইটি সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস চক্র প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

প্রসঙ্গত, হিমালয়ের পরিবেশ রক্ষা এবং লাদাখের মানুষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার রক্ষার দাবিতে ও লাদাখের পরিবেশ ধ্বংস করে বহুমূল্য খনিজ সম্পদ কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন রমন ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদ শিক্ষা সংস্কারক সোনম ওয়াংচুক লড়াই করে চলেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন লাদাখ সহ সমগ্র হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্রে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলছে। উন্নয়ন ও পর্যটনের নামে এই ধ্বংসলীলা

আরও প্রকট হচ্ছে। উত্তরোত্তর বাড়ছে ধস, হরপা বান, বন্যা ও জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা। লাদাখের সাংবিধানিক স্বাধিকার হরণ করে চলছে তাদের কণ্ঠরোধ। দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ রক্ষায় অহিংস আন্দোলন চালাচ্ছেন সোনম ওয়াংচুক। করেছেন কারাবরণও(সেপ্টেম্বর ২০২৫-এপ্রিল ২০২৬)। গতবছর জানুয়ারি মাসে কলকাতায় এসে তিনি বলেছিলেন, হিমালয় বাঁচানোর লড়াই কীভাবে সারা ভারতের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি চান প্রতিটি রাজনৈতিক দল গ্রিন পার্টি হয়ে উঠুক, স্বপ্ন দেখেন এমন এক বিশ্বের যেখানে উঁচু নিচু, ডান বাম বিভেদ নেই। বর্তমানে চলা অনশন আন্দোলনে মূল দাবিগুলি হল , প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারির দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের জবাবদিহি ও পদত্যাগ, শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, পরীক্ষা কেলেঙ্কারির ফলে আত্মহত্যা করা ছাত্রদের পরিবারগুলিকে অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ, এবং লাদাখের সাংবিধানিক স্বাধিকাররক্ষা।

১৭ দিনের এই অনশন কর্মসূচী এবং ২৫ দিনের ধরনায় কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আন্দোলনকারীদের সাথে সরকারের তরফে একবারও যোগাযোগ করা হয়নি! বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমও সিজেপির আন্দোলন সম্পর্কে নীরব। আগামী ২০ জুলাই সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হবে। সোনম ওয়াংচুক ওইদিন সংসদ ভবন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ মিছিলের ডাক দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর শারীরিক অবস্থার আশঙ্কাজনক অবনতি ঘটেছে। তাঁর ওজন কমেছে প্রায় ৮.২ ওকেজি, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নেমে দাঁড়িয়েছে ৬৭ মিলিগ্রাম, রক্তচাপ ১০৭/৭০, উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারিয়েছেন। শরীর দুর্বল হয়ে পড়লেও অনশন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল আছেন তিনি। অনশনের ১৩ দিনে তিনি বলেন, অনশনের প্রথম কদিন কঠিন ছিল, এখন শরীর অনাহারে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। আমার দেহের ওওওফ্যাট গলছে, পেশি দুর্বল হচ্ছে, হাড় দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমি এখনও কর্মক্ষম। আন্দোলনে সকল রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'এই লড়াই শুধু শিক্ষা ব্যাবস্থার সংস্কারের জন্য নয়, পুরো সমাজের জন্য। যদি প্রশ্ন ফাঁস হয় তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেমন ডাক্তার পাবে?

আজ সর্বত্র অসততা, পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে ভোট, সর্বই বিক্রয়যোগ্য। উন্নত জাতি গঠনের কথা নাহয় ছেড়ে দিলাম, এই অবস্থায় আমরা বিশ্বের (গ্লোবাল ভিলেজ) মুখোমুখি কীভাবে হব?' সরকারের সাথে সমস্ত যোগাযোগের পথ তিনি খোলা রেখেছেন।

সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি ও সরকারের উদাসীনতা সারা দেশে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। নানা অঞ্চলে মানুষ প্রতীকী অনশনে সামিল হচ্ছেন। অরুন্ধতি রায়, তনিকা সরকার, জহর সরকারের মতো বহু বিশিষ্টজন অনশন প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করছেন। ইন্ডিয়া জোটের তরফে সাংসদ মহুয়া মৈত্রকেও অনশন প্রত্যাহারের দাবি জানাতে দেখা গেছে।

* উপরোক্ত দাবীতে ২০ জুলাইপার্লামেন্ট অভিযান।

রামের নামে ভোটের পর রামের নামে লুঠ সঙ্ঘ পরিবারের মুখ থেকে মুখোশ খুলে পড়েছে

অমিতাভ সিংহ

অযোধ্যার রাম মন্দিরে কয়েক হাজার কোটি টাকা মূল্যের সোনা, রূপা ও অর্থ চুরি প্রকাশ্যে আসার পর সঙ্ঘ পরিবারে মুষলপর্ব শুরু হয়ে গেছে। হিন্দুত্ববাদীদের নয়নের মণি আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আদতে যে দুর্নীতির আখড়া তা এখন হিন্দুত্ববাদীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। নব্বুই এর দশকে উত্তুঙ্গ রাম জন্মভূমি আন্দোলন চলছে, সঙ্ঘ পরিবার রামশীলা কর্মসূচির মাধ্যমে হিন্দুদের সমর্থন কুড়োতে ব্যস্ত, মন্দির নির্মানে চলছে অর্থ সংগ্রহ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি তখন অশোক সিংঘল। জনৈক সাংবাদিক তাকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন সংগৃহিত অর্থের যথাযথ হিসাব বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাখছে কিনা? তার উত্তরে তিনি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাই নয়, উচ্চস্বরে উত্তর দিয়েছিলেন 'আপনি কি মনে করেন আমরা কোটি কোটি হিন্দুর ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে ছেলেখেলা করার মত লোক? আজ তিনি জীবিত থাকলে দেখতেন যে তার সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ সভাপতি চম্পত রাই এই বিশাল অংকের অনুদান চুরির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, যিনি আবার রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদকও বটে। তিনি একসময় অশোক সিংঘলের ঘনিষ্ট সহযোগীও ছিলেন। রাম জন্মভূমি আন্দোলনের আরেক পরিচিত মুখ যিনি লালকৃষ্ণ আদবানীর সহযোগী ছিলেন সেই করসেবক সন্তোষ দুবে এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।

মাত্র কয়েকদিন আগে এই চুরির অভিযোগ ওঠার পর চম্পত রাই বলেছিলেন এরকম কোন ঘটনাই ঘটেনি। তিনি এই অভিযোগকে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘ

পরিবারের ভিতর থেকে প্রবলভাবে এই অভিযোগ ওঠে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা ভিএইচপি'র সভাপতি (আন্তর্জাতিক) অলোককুমার, রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের সহসভাপতি পদ থেকে চম্পত রাই এর ইস্তফার পরামর্শ দিয়েছেন।

এই কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর কোন এফআইআর হয় নি। প্রথমে ট্রাস্ট ও সরকারের পক্ষ থেকে ধামাচাপা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছিল। যে আরএসএস নিজেদের সংগঠনের মূলমন্ত্র হিসাবে শৃঙ্খলা, সেবা ও জাতিগঠন বলে প্রচার করে, আজ তা কঠিন পরীক্ষার মুখে।সেই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসবলে এই ঘটনার নিন্দা করেও বলেন কিছু হিন্দুবিরোধী ও দেশবিরোধী শক্তি এই ঘটনাকে ব্যবহার করে হিন্দু সমাজকে কলঙ্কিত করার ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্রটা ঠিক কি তা কি তিনি বলতে পারবেন ? উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী এককাঠি এগিয়ে রীতিমত হুমকি দিয়েছেন।

ভক্তদের দান চুরি হয়েছে, এবং তা করেছে মন্দিরের মাথারা তা প্রকাশ্যে আনা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ কিভাবে হয় ? বরং এটা বলাই যায় এই কেলেঙ্কারি, প্রকাশ্যে না আনাটাই অপরাধ। বলা যায় এর ফলে হিন্দুধর্মের অন্যতম ক্ষেত্রের মর্যাদা রক্ষার প্রয়াস করা হয়েছে। জনগনের টাকায় তৈরী রামমন্দিরের অর্থ তছরুপের জবাবদিহির দাবীকে কিভাবে হিন্দুবিরোধী বলে আখ্যায়িত করা যায় ? ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি এই মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্টা করার সময় নরেন্দ্র মোদী সভ্যতার ন্যায় বিচার এর প্রতীক বলে বর্ণনা করেছিলেন। আর আজ এতবড়ো কেলেঙ্কারির পর তিনি নিশ্চুপ। আর সঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত? সাংবাদিকরা এবিষয়ে প্রশ্ন করলে রাম রাম বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। দায় নিতে তিনিও মোদীবাবুর মত নারাজ। অথচ রামের নাম নিয়ে আজ বিজেপি ক্ষমতায়। মোদী তার নাম নিয়েই প্রধানমন্ত্রী। সরকারসহ সর্বত্র আরএসএসের নিয়ন্ত্রণ এই রামের দৌলতে। আর যখন রামের নামে এত বড় চুরি ধরা পড়ল তখন দুজনেই কেমন স্পিকটিনট ! এই ট্রাস্টের মোট সদস্যসংখ্যা ১৫ জন। কাগজে কলমে এটা স্বশাসিত হলেও তা নিয়ন্ত্রণ করত সরকার ও সঙ্ঘ পরিবার। ট্রাস্টি বেছে নেওয়া হত আরএসএস, বিজেপি ও বিএইচপির সুপারিশে। তাই কয়েকজন কর্মী ও কর্মকর্তাকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে তারা নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলতে পারে না। যেকোন সংগঠন, বিশেষ করে এই ধরণের ট্রাস্ট, যেখানে দিনে লক্ষ লক্ষ টাকার অনুদান সংগৃহিত হয়, সোনা রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী দান হিসাবে আসে সেখানকার শক্তপোক্ত ও পেশাদার প্রশাসন, স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণ ও কঠোর নজরদারি দরকার। নাহলে তছরূপের আশঙ্কা থেকে যায়। জনতার টাকার অপব্যয় বা চুরি হলে তা হয় ফৌজদারি অপরাধ।কোটি কোটি সাধারণ ভক্তদের আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

তবে এটা তো নতুন নয়। ২০২২ সালে জমি কেনার সময় বেশ কিছু অভিযোগ ও অনিয়ম সামনে আসে। তাতে বোঝা যায় ট্রাস্টের সদস্যরা দুর্নীতিতে যুক্ত। বিশেষ করে চম্পত রাই। মন্দিরের জমি তো সরকার দিয়েছে। কিন্তু তৎসংলগ্ন জমি কেনা হয় অনেকটা। একটি জমি ২ কোটি টাকায় কিনে ৫/১০ মিনিটের মধ্যে ১৮. ৫ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয় ট্রাস্টকে। কাটমানি যায় চম্পতের ঘনিষ্ঠের পকেটে। আবার তিন কোটি টাকার জমি ট্রাস্ট কেনে ২৪ কোটি টাকায়। হাত সেই চম্পতের রাই এর। একটা নয় কোটি টাকার জমি বিক্রি করা হয় ৫৫ কোটি টাকায়। এরকম বহু ঘটনা সামনে এলেও সঙ্ঘ পরিবার বা বিজেপির সরকার কোন ব্যবস্থা নেয় নি বলেই আজ এত বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি হতে পারল। হিন্দুদের অনুভূতি নিয়ে ছেলেখেলা করা হল। বহুজন অর্থ দিয়েছেন কোটি কোটি টাকা, রশিদ দেওয়া হয় নি। সোনার গহনা, রূপোর ইট দান হিসাবে যা যা দেওয়া হয়েছে তার রশিদও দাতারা পান নি। শিবসেনা ও উদ্ধব থ্যাকারে এক কোটি টাকা ও চারটি রূপোর ইট দিলেও পাঁচ বছরে রশিদ পান নি। জনৈক মহিলা অভিযোগ করেছেন তিনি একটা সোনার গড়ুড় দান করেছিলেন যা প্রধান ফটকে লাগানোর কথা ছিল। তা উধাও হয়ে গেছে।

মন্দির নির্মানের সময় ঠিকাদারদের কাছ থেকে ৪০ শতাংশ কমিশন নেওয়া হত। কারা নিতেন ? চম্পত রাই এর ঘনিষ্ঠজনেরা। এই ট্রাস্টের একাউন্টস ইনচার্জ বা ভারপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক মনিপাল সিং গরমিল বন্ধে কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তারপরই তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিরি জানেনই না কোন পদ্ধতিতে দান সংগ্রহ করা হয়। তার কাছে নাকি চেকবই থাকত না আর তিনি নাকি চেকে সই করতেন না। টাকা পয়সার হিসাব রাখার জন্য বেছে নেওয়া হত আত্মীয়স্বজনকে। টাকা গোনার হল থেকে যখন তখন কোন চেকিং ছাড়াই বেরিয়ে আসা যেত। এই অনুদানের কোন রেকর্ড রাখা হয় নি। ১২. ৫ কোটি ভক্তদের ৩৩ হাজার কোটি টাকা চাঁদা তোলার কোন রেকর্ড নেই, ভাবা যায় ? এসব সত্বেও উত্তরপ্রদেশ সরকার এফআইআর করে নি, মামলাও করতে রাজী হয় নি। বরং এক সদস্যের কথায়,কেন এবিষয়ে আলোচনা করতে হবে ? হিন্দুরা টাকা দিয়েছে, চুরি যদি হয়ে থাকে হিন্দুরাই করেছে। আপত্তির কি আছে ? যেন হিন্দুর ছেলে ধর্ষণ করলে তাতে কি হয়েছে ? এটা তারা করতেই পারে। আশ্চর্য। ভোট চুরি, সিট চুরি, মন্দিরে অনুদান চুরি-- এসব জলভাত যাদের কাছে তার কি জবাব হয়।

এফআইআর ছাড়া বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন হল। তাদের অন্তবর্তীকালীন রিপোর্টের ভিত্তিতে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হল। যার মধ্যে চম্পত রাইয়ের গাড়ীচালক রামশংকর ওরফে টিন্নুও রয়েছে। চম্পত রাই তাকে সব চাবি রাখতে দিত। সিটের রিপোর্টে বলা হয়েছে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ১৫০ জন সেবাদারের আর্থিক সম্পত্তি এতটাই বেড়েছে যে তাদের অনেকেই দেশের বিভিন্ন পর্যটন স্থলে হোটেল রিসর্ট কিনেছেন। এদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা ছিল চম্পত রাই এর। তাই চম্পত রাইকে অছি পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ও সদস্য অনিল মিশ্রকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু কেন কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিরি পদত্যাগ করবেন না। তার দায়িত্ব কি তিনি পালন করেছেন? অতীতে আরএসএস ও ভিএইচপির বিরুদ্ধে ১৪০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ করেছিল নির্মোহী আখাড়া। আজ উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণসমাজ বিজেপির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমেছে। কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়ে তদন্ত কমিটি ও আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্ত করার দাবী জানিয়েছে। তারা বলেছে বিজেপি তাদের সংগঠনে মন্দির শাখা খুলে দেশের মন্দিরগুলির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ সিং রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করছেন এই কেলেঙ্কারি নিয়ে। তাতে বিজেপির ভোট ব্যাঙ্কে ধ্বস নামার আশঙ্কায় যোগী এক নতুন তাস খেলেছেন। তিনি মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি উদ্ধারের ডাক দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের যাদব সম্প্রদায় নিজেদের কৃষ্ণের বংশধর বলে মনে করে। এই কেলেঙ্কারি বিজেপিকে সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপ্রদেশে বেজায় বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে সঙ্ঘ পরিবারের ভাবমূর্তিতে কালি পড়েছে। তাদের মুখোশ খসে পড়েছে।

রাজ্য সংবাদ

বারুইপুরের 'অপরাজিতা' গণধর্ষণ ও হত্যা; একটি প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

শুভ প্রতিম

বারুইপুরের নৃশংস গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি, শ্রমজীবী মহিলা সমিতি ও আমরা এক সচেতন প্রয়াস গত ৬ জুলাই সেখানে একটি তথ্যানুসন্ধান চালায়। তথ্যানুসন্ধান দলে ছিলেন সুচিত্রা হালদার, খাদিজা খাতুন, নমিতা হালদার, রেহানা খাতুন, নির্মলা সরদার, ফারুক উল ইসলাম এবং শুভ প্রতিম। বর্তমান প্রতিবেদনটি সেই তথ্যানুসন্ধানেরই একটি প্রাথমিক রিপোর্ট। সেইদিনের পরের ঘটনাক্রম নিয়ে শুভ প্রতিম কিছু সংযোজন করেছেন প্রতিবেদনের শেষে।

গত শনিবার ৪ জুলাই ২০২৬ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের সূর্যপুরে এক ১২ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। এক দিন নিখোঁজ থাকার পরে ৫ জুলাই ২০২৬ সকালে সূর্যপুর স্টেশন-সংলগ্ন পুকুর থেকে তার দেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের দাবি, কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে মেয়েটি গণধর্ষণের শিকার। মাথায় আঘাত ও মারধরে অর্ধমৃত কিশোরীকে পুকুরে ফেলা হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়েছে এলাকা।

ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগে ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতেরা হলেন আনন্দ সর্দার, প্রভাস মণ্ডল এবং দিবাকর সর্দার। কিশোরীর দেহ উদ্ধারের পর গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় এক যুবকের। তার নাম ইন্দ্র তাঁতি।

গত ৬ জুলাই ২০২৬, শ্রমিক অধিকার, নারী অধিকার ও মানবাধিকার সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি, শ্রমজীবী মহিলা সমিতি ও 'আমরা এক সচেতন প্রয়াস'-এর পক্ষ থেকে তথ্যানুসন্ধান করতে যাওয়া হয়। কথা বলা হয় মৃতা কিশোরীর পিতা, আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে। অনেকেই নিজের নাম প্রকাশ করতে চাননি। তাঁদের অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই রিপোর্টে তাঁদের প্রকৃত নাম প্রকাশ করা হয়নি। দেশের আইন অনুসারে নির্যাতিতা তথা মৃতা কিশোরীর নাম, তার পরিবারের ঘনিষ্ঠজনের নাম প্রকাশ করা যায় না। এখানে তা প্রকাশ করা হল না। এটা একটি অন্তর্বতীকালীন রিপোর্ট। সূর্যপুরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে এবং আমাদের অভিজ্ঞতার নিরিখে একটি দাবিপত্রও আমরা এই রিপোর্টের সঙ্গে যুক্ত করছি।

পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের কথা বলেন। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুসারে, পুকুরে ফেলার সময়েও কিশোরী জীবিত ছিল। মেয়েটির পেটে জল ছিল বলে ডাক্তাররা জানিয়েওছেন তাঁদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে। অর্থাৎ জলে ফেলার সময়েও মেয়েটি জীবিত ছিল। দেহে ২৮টির বেশি ক্ষতচিহ্ন, মাথার ক্ষত থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এবং শেষ পর্যন্ত জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে, পুলিশ জানায়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী ৬৫ ধর্ষণ, ৭০ (২) গণধর্ষণ, ১০৩ (১) খুন, ২৩৮ তথ্য-প্রমাণ লোপাট, ৬১অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং পকসো আইন অনুযায়ী ধারা ৬, ধারা ১৩৭ (২) ও ১৪০ (২) নাবালিকাকে অপহরণ-এ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শেষ সময় পর্যন্ত সে লড়াই করে গেছে, তাই আমাদের কাছে সে অপরাজিতা। এই রিপোর্টে তাকে 'অপরাজিতা' নামেই অভিহিত করা হল।

তথ্যানুসন্ধান দলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন; সুচিত্রা হালদার, খাদিজা খাতুন, নমিতা হালদার, রেহানা খাতুন, নির্মলা সরদার, ফারুক উল ইসলাম এবং এই প্রতিবেদক।

(১)

আমরা সকাল ১০টার সময় সূর্যপুর স্টেশনে পৌঁছই। সূর্যপুর স্টেশন থেকে অনতিদূরেই সেই পুকুর যেখানে অপরাজিতার লাশ উদ্ধার করা হয়। সেখানে মোতায়েন ছিলেন একজন পুলিশকর্মী। শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর রেললাইনের এই স্টেশনের শিয়ালদা-প্রান্তের এলাকাটা নির্জন। উঁচু রেললাইন থেকে নিচের জলাশয় অনেক নিচেতে। সেখানে কয়েকটি ঝোপরপট্টি বা বস্তি আছে। কিন্তু কোথাও কেউ বসবাস করে বলে মনে হল না। এলাকার সমাজবিরোধীদের আড্ডা এখানে। জানা গেল রাত্রে তাদের আনাগোনা বাড়ে।

স্টেশন থেকে সূর্যপুর বাজার সর্বত্র পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান। বাজারে দোকান সব খোলা ছিল। আমরা যখন অপরাজিতার বাড়িতে তখন ৫-৬ জন আত্মীয়-পরিজন সেখানে ছিলেন। ছিলেন সিভিল ড্রেসে থাকা পুলিশকর্মী।

বাবা এবং অন্যান্যরা

অপরাজিতার বাড়িতে আমরা কথা বলি বাবার সঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই কথা বলার মতো অবস্থায় তিনি ছিলেন না। মেয়ের মা সেখানে ছিলেন না, তিনি ছিলেন গ্রামের বাড়ি, রতনপুরে। বাবা কাঠের ব্যবসা করেন। তিনটি মেয়ে ও এক পুত্র নিয়ে তাঁদের সংসার। 'অপরাজিতা' তাঁর ছোট মেয়ে। পড়ত পঞ্চম শ্রেণিতে, স্থানীয় কেয়াতলা হাইস্কুলে। বাবা বলেন; আমি আসামির ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি। আমরা সরকারকেও এই অনুরোধ জানাচ্ছি, যাতে কঠিনতম শাস্তি হয় আমার মেয়ের খুনিদের। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বলেন; বেশি কিছু বলব না। আমরা ফাঁসি চাইছি। পুলিশ প্রশাসন আছে, বেশি কিছু বলব না। যেহেতু কালকে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন, এই বিষয়ে আর কিছু বলা যাবে না।

;কাল কি মুখ্যমন্ত্রী আসবেন?

;হ্যাঁ, উনি আসবেন।

বাবা বলেন; হ্যাঁ উনি আসবেন। উনি যখন কথা দিয়েছেন।

তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আপনাদের আস্থা আছে?

;হ্যাঁ, আছে।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরও একজন বলেন;

;হ্যাঁ, আমাদের পুরোপুরি আস্থা আছে।

কিশোরীর পিতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, উনি আগামীকাল আসবেন। আমি আসামিদের ফাঁসির দাবি জানিয়েছি। উনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন আমার দাবি উনি রাখবেন। তবে কারও সাথে কোনও কিছু বলতে বারণ করছেন। উনি আরও বলেন যে আমার বাড়িতে পুলিশ আছে সবসময়, আমাদের ফোনও রেখে দিয়েছে ওনারা। অভিযুক্তরা সকলেই বিজেপির কর্মী ও সমর্থক বলে জানান কিশোরীর পিতা-সহ উপস্থিত ব্যক্তিরা।

বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন হেলাল লস্কর (নাম পরিবর্তিত)। কতটা নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে তা উনি জানান। ওঁর বাড়ি রতনপুরে। যেখানে অপরাজিতার বাবার পৈতৃক ভিটে। যথেষ্ট উষ্মার সঙ্গে তিনি জানাচ্ছিলেন;

;এখন এত পুলিশ দেখছেন, বাড়ির মধ্যেও তাদের আনাগোনা, কিন্তু মেয়েটা নিখোঁজ হওয়ার পর যদি তারা তৎপর হত তাহলে হয়তো আমাদের মেয়েটা বেঁচে যেত।

;পুলিশের ভূমিকায় আপনাদের ক্ষোভ আছে?

;অবশ্যই আছে। কেন পুলিশ বিজেপি নেতার কথায় ছেড়ে দিল মূল আসামিকে। পরে গ্রামের মানুষের ক্ষোভ দেখে আর ওপর থেকে চাপ দেওয়াতে তৎপর হয়েছে।

;কে চাপ দিয়েছে?

;রাজ্য সরকার।

;মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলছেন?

;হ্যাঁ, উনি ফোন করেছিলেন। আসবেন জানিয়েছেন। কিছু করে দেখান, তাহলে বুঝব।

;মমতা বন্দোপধ্যায় আসতে চেয়েছিলেন?

;উনি এসে কী করবেন? ওনার আমলেই তো আরজিকর হয়েছে? তামান্নাকে খুন করেছে ওনার দলেরই গুণ্ডারা। আনিস খানকে কে খুন করল? ওনার ভূমিকা কী ছিল?

মৃতা কিশোরীর বাড়ির সামনে আমরা কথা বলি প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সঙ্গে। সেখানে কথা হয় মূলত বাবলু মোল্লার সঙ্গে।

বাবলু মোল্লা : আমরা প্রায় ৫-৬টি গ্রামের ৫০-৬০ হাজার মানুষ এখানে ছিলাম (সূর্যপুর বাজার)। সেখানে পুলিশ আমাদের সঙ্গে কথা না বলে, কোঅপারেট না করে, লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। তাতে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জনরোষে একজন মারা যায়,

তার নাম ইন্দ্র তাঁতি। পাবলিকের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে যে ক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তার জন্যই এই ঘটনা হয়েছে। এটা না হলে এখানে এত পুলিশ রাখতে হত না।

;পুলিশের এই পক্ষপাতিত্বের কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?

;পুলিশের পক্ষপাতিত্বের কারণ কেন, কী বৃত্তান্ত আমরা বলতে পারি না। আমরা জানি না কেন করেছে, স্থানীয় বিজেপির যে লিডার, শান্তনু, সেও পুলিশকে প্রভাবিত করে সকালবেলা মূল আসামি আনন্দকে ছাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। শান্তনু এইরকম কাণ্ডকারখানা করেছে। তাই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা জানি না, পুলিশ কেন এটা করেছে। তবে প্রশাসনের তরফ থেকে আইজি সাহেব যে আশ্বাস দিয়েছেন ও মুখ্যমন্ত্রী যে আশ্বস্ত করেছেন, আমরা সেই আশ্বাসের প্রতি আশাবাদী। যে আমাদের এই বাচ্চাটা ন্যায়বিচার পাবে এবং আসামিরা কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি পাবে। আমরা শুধু এইটুকুই আশা করছি।

;এই ঘটনা নিয়ে সাম্প্রদায়িক কোনও উত্তেজনা আছে কি?

;না এখানে হিন্দু-মুসলিম কোনও ব্যাপার নেই। দীর্ঘদিন সূর্যপুর সম্প্রীতির জায়গা। হিন্দু-মুসলিম আমরা মিলেমিশে থাকি। ভাই-ভাইয়ের মতো থাকি। আমাদের ঈদে তারা আসে, তাদের পুজোতে আমরা মিলেমিশে চলি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা নিমন্ত্রিত হই, একসঙ্গে খেলাধূলা করি। একসঙ্গে বসে চা খাই, এক্ষুনি বসে চা খাচ্ছিলাম (হাত দিয়ে চায়ের দোকান দেখিয়ে) আমার এক হিন্দু বন্ধুর সঙ্গে।

;আচ্ছা এখানে আগেকার চিত্র কেমন, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কেমন?

;দীর্ঘদিন ধরে সূর্যপুর সম্প্রীতির জায়গা। (মিলিতভাবে)

কথা হল জগন্নাথ মণ্ডলের (নাম পরিবর্তিত) সঙ্গে। সূর্যপুর বাজারেই তাঁর দোকান। আমরা কথা বলি অল্পসময়। উনি খুব বেশি কিছু বলতে চাইছিলেন না।

জগন্নাথ মণ্ডল — এই অপরাধের শাস্তি হোক, আমরা চাই। মেয়েটা আমার দোকানেও আসত। এখনও গলা কেঁপে যাচ্ছে কিছু বলতে। কী বলব, বিগত জামানা থেকেই এলাকায় সমাজ-বিরোধীদের রমরমা। মাদকচক্র আছে।

;এখনও কি তারা সক্রিয়?

;হ্যাঁ, তারা আছে। কেউ কি সমাজবিরোধীদের কিছু বলে?

;সরকার বদল হয়েছে, কিছু কি বদল হয়নি?

;সে আমি কী বলব! (কিছুটা সাবধানী হয়ে)

;গতকাল গণপ্রহারে একজনের মৃত্যু হল, কিছু বলুন?

;প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারাই জড়িত তাদের পেলে পাবলিক ছাড়বে না। তবে এর ফলে এলাকায় উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

;উত্তেজনা মানে কি হিন্দু-মুসলমান?

;সেসব বলতে পারব না। (এবার আরও সাবধানী, দোকানে কিছু খদ্দের এসেছে তখন)

(২)

গণপ্রহারে মৃত্যু প্রসঙ্গ

এই বিষয়ে সাধারণভাবে কেউ মুখ খুলতে চাইছিলেন না। রোশন মোল্লা (নাম পরিবর্তিত)-র ওষুধের দোকান। তিনি প্রথমে জানালেন তিনি ওইসময় ছিলেন না। পরে বলেন;

রোশন মোল্লা: সাধারণ মানুষ ক্ষেপে গেলে কিছু করার থাকে না।

;কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া কি ঠিক?

;দেখুন পাবলিকের ওসব খেয়াল থাকে না। তা ছাড়া পুলিশ যদি খুনিকে ছেড়ে না দিত তাহলে পাবলিক ক্ষেপে যেত না।

আর কিছু বলতে চাননি উনি। আমরা কথা বলি স্থানীয় ফলের দোকানের মালিকের সঙ্গে। তিনি জানান, ঘটনার সময় এখানে কয়েক হাজার লোক, আশেপাশের সব গ্রামের মানুষ। রাজ্য সরকার যদি তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয় তাহলে কী হবে জানতে চাইলে তিনি চুপ করে যান। বলেন, এসব বলতে পারব না।

অন্যান্য

জনৈক চায়ের দোকানদার, যিনি আদতে বিহারের বাসিন্দা, বহুদিন ধরে সূর্যপুর বাজারে তাঁর দোকান। সেখানে আমাদের সঙ্গে দেখা হয় জিন্নাতের (নাম পরিবর্তিত) মায়ের সঙ্গে। দোকানে বসা আমানত মোল্লা (নাম পরিবর্তিত) জানান, জিন্নাতের সঙ্গে কী হয়েছিল, জানাও জিন্নাতের মা। জিন্নাতের মা সবে বলতে শুরুছেন, তআমার মেয়েকে টন্ট করত ওরাখদ, রাস্তার ওপারের বাড়ির বারান্দা থেকে একজন চিৎকার করে জানালেন, তকারুর কাছে মুখ খুলো না, জিন্নাতের মা। চুপ থাকো।দ না, তারপর উনি আর কিছু বলেননি। আমাদের পক্ষ থেকেও কোনও জোর করা হয়নি। ওরা কারা জানতে চাইলে আমানত মোল্লা বলেন, কারা আবার, এই যারা এত বড় কাণ্ড ঘটাল। এরা নারীপাচার, ড্রাগ সবকিছুতেই যুক্ত।

সাধারণভাবে বেশিরভাগ মানুষ জানান, পাঁচ থেকে ছয়জন ব্যক্তি এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। কিশোরী শনিবার বিকেলে খাবার কিনতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তার পর থেকে তার খোঁজ মেলেনি। পরিবারের অভিযোগ, চারজন তাকে তুলে নিয়ে যায়। তাকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে বলেই তাঁদের অনুমান।

অভিযুক্তদের একজনকে রবিবার থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়, এই ব্যাপারে থানায় প্রভাব খাটায় শান্তনু মণ্ডল। প্রতিবেশীদের দেওয়া তথ্য অনুসারে উক্ত শান্তনু মণ্ডল এখানের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র মণ্ডল সভাপতি।

এলাকায় কথা বলে জানা যায় অভিযুক্ত আনন্দ মণ্ডল এর আগেও মেয়েদের উত্যক্ত করার অভিযোগে অভিযুক্ত। সংবাদে প্রকাশ, যে অটোতে চাপিয়ে কিশোরীকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই অটোচালক গণপ্রহারে মারা যায়। আমরা এই বিষয়ে জানতে চাইলে কেউ কিছু বলতে চাননি। সামগ্রিকভাবে এলাকায় ভয় ও উত্তেজনা প্রবল। কিশোরীর বাড়িতে কথা বলার সময়ও আমাদের সিভিল ড্রেসে পুলিশের উপস্থিতি নজরে এসেছে।

কিশোরীর বাড়িতে উপস্থিত ব্যক্তিরা একবাক্যে বলেছেন এই ঘটনার শাস্তি চেয়েছে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই। কিন্তু বিভিন্ন মিডিয়াতে যেভাবে সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে বা বিষয়টাকে ধর্মীয় প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে তাতে শঙ্কিত তাঁরা।

আমরা ফোনে কথা বলি কেয়াতলা হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি জানান, অপরাজিতা খুব ভালো মেয়ে। গোটা স্কুল হতবাক ও শোকবিহ্বল। তিনি ইস্কুলে গিয়ে কথা বলতে বলেন, ফোনে খুব বেশি কিছু বলতে চান না।

এই প্রেক্ষিতে প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবিঃ

অবিলম্বে সকল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হোক, শান্তনু মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হোক।

অপহরণ, ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যা কোনও বড় ষড়যন্ত্রের অংশ কিনা তা তদন্ত করা হোক।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জুড়ে নাবালিকা পাচার চক্র সক্রিয় বলে অভিযোগ। সাধারণ মানুষের বয়ানে এলাকায় পাচার ও ড্রাগচক্রের কথা জানা গেছে, তাঁরা জানিয়েছেন, পুলিশ এ বিষয়ে জানে না তা নয়। এই চক্র ভাঙতে রাজ্য সরকার জরুরি কিছু পদক্ষেপ নিক।

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার ও অভিযুক্তদের বাঁচানোর ভূমিকা স্পষ্ট। দোষী পুলিশ আধিকারিকদের চিহ্নিত করা হোক, আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

পুলিশের অতিরিক্ত তৎপরতা আমাদের নজরে এসেছে, ফলে মানুষ কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। এলাকায় চাপমুক্ত পরিবেশ রাখতে হবে। পুলিশ-রাজ চলবে না।

গণপিটুনি ও হত্যার সঙ্গে যুক্ত সকল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এলাকায় ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কোনওক্রমেই যাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, হিংসা না ঘটে সে দিকে নজর রাখা দরকার।

৭ জুলাই, ২০২৬

তথ্যনুসন্ধান দলের অন্যতম সদস্য, শুভ প্রতিমের সংযোজন

পরবর্তী ঘটনাক্রম

পরবর্তী ঘটনাক্রম যা আমাদের তথ্যনুসন্ধানের পরে ঘটতে থাকে, যা শুধু ওই এলাকার নয় রাজ্যের ইতিহাসে এক বড় মাইলফলক। যে পুকুর থেকে ১২ বছরের মেয়ের নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেই পুকুর থেকেই এক ব্যক্তির দেহ পাওয়া যায়, গত সোমবার, ৬ জুলাই। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণকান্ত হালদার। গত শুক্রবার থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

বারুইপুরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ধৃত অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যু হল পুলিশের গুলিতে। প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাকেই। পুলিশ সূত্রে দাবি, মঙ্গলবার, ৭ জুলাই রাতে তাকে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য অপরাধস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই সে পুলিশের হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ। আত্মরক্ষার্থে পুলিসও গুলি চালাতে বাধ্য হয়। ফলে, অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল আহত হয় এবং হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তদন্ত চলাকালীন এইভাবে পুলিশের গুলিতে অভিযুক্তের মৃত্যুকে আইনি ভাষায় এ-ন-কা-উ-ন-টা-র বলা ছাড়া অন্য কোনও প্রতিশব্দ আছে বলে আমাদের জানা নেই। খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠছে এই হত্যা নিয়ে। কেন অত রাত্রে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হল? কেন আশেপাশের মানুষ গুলির শব্দ পেল না? আইন অনুসারে ঘটনার পুনর্নির্মাণ ক্যামেরাবন্দি করা উচিত, তা কি করা হয়েছে?

২০১৪ সালে Peoples Union for Civil Liberties (PUCL) বনাম মামলায় ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আরএম লোধার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ একটি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। এই রায়ে পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনা তদন্তের জন্য ১৬টি বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা জারি করা হয়। আমরা জানি না প্রভাস মণ্ডলের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করার সময় এই নির্দেশিকা কতটা মানা হবে! ময়নাতদন্তর ভিডিও রেকর্ড করার কথা, হেফাজতে মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে জানানোর কথা।

সমাজ-মন ও এনকাউন্টার বা গণপিটুনিতে হত্যা

যে-কথা উল্লেখ করা দরকার তা হল সমাজে গণপিটুনির গ্রহণযোগ্যতা। বলতে দ্বিধা নেই এখন গণপিটুনির সামাজিকীকরণ তো হয়েছেই সামাজিক গণমাধ্যমের কল্যাণে তা এখন জনপ্রিয় পথ।

একইভাবে এনকাউন্টার। এ-কথা ঠিক সাধারণ মানুষের আশাহীনতা আছে বিচারের দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে। তাই তারা চায় দ্রুত শাস্তি। 'খুন কা বাদলা খুন'। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, যাতে প্রতিশোধের দৃশ্যে হাততালিতে ফেটে পরে সিনেমা হল। 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' পুলিশ অফিসারের চরিত্র জনপ্রিয়তা পায়। 'জনমত'-এর সামনে জনপ্রিয়তা বজায় রাখার দায়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যা বলে তাতেও 'নিকেশ' করার কথা থাকে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের ভোটের আগে হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, তরেকর্ড করে রাখুন বিরোধী দলনেতার কথা, বিজেপি এলে এই ধর্ষকদের কোর্টে পাঠাব না, সকালে জমা নেব বিকেলে খরচ করব। যোগী আদিত্যনাথ-হিমন্ত বিশ্বশর্মার দেখানো পথে সরকার চলবে, কথা দিয়ে গেলাম।দ কার্যক্ষেত্রে হলও তাই। রাত্রেই খরচ হয়ে গেল অন্যতম অভিযুক্ত, প্রভাস মণ্ডল।

এই ঘটনা শোনার পর সূর্যপুরে কিছু মানুষের উল্লাস শোনা যায়, যা এখন আবার উদ্বিগ্নতায় গ্রাস করেছে, 'গণপ্রহারে হত্যা'-য় অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশি অভিযান শুরু হওয়াতে। তথ্যানুসন্ধানের বাইরে সমাজমনের এই হর্ষ-বিষাদ আমাদের বড় প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। সরকার যে এত বড় অপরাধ করল, সেই নিয়ে প্রশ্ন কোথায়? বাসে-ট্রেনে সর্বত্র এনকাউন্টার নিয়ে বীরোচিত সংলাপ। প্রমাণ লোপাটের জন্য পুলিশ এনকাউন্টার ঘটাল কিনা, এই প্রশ্ন 'সংখ্যাগুরু' প্রতিহিংসা-প্রেমীদের উল্লাসে উড়ে যাচ্ছে নিমেষে।

আমরা দাবি জানাচ্ছি বিচারবিভাগীয় তদন্তের। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের দিয়ে এই এনকাউন্টার হত্যার তদন্ত হোক।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি, শ্রমজীবী মহিলা সমিতি এবং আমরা এক সচেতন প্রয়াস কর্তৃক প্রকাশিত।

বারুইপুর এনকাউন্টার : আইন নয়, জঙ্গলের শাসন ; সুজাত ভদ্রের তীব্র নিন্দা

নাগরিক প্রতিবেদন : ৮ জুলাই গভীররাতে এক প্রধান অভিযুক্তের পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যু নিয়ে বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী সুজাত ভদ্র তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং ঘটনাটিকে বরাবরের মতো 'আইনের শাসন' হিসেবে নস্যাৎ করে বলেছেন, 'এটা আইনের শাসন নয় ; এটা জঙ্গলের শাসন।' তিনি আরও বলেন, 'রক্ত পড়ছে মানে আইন ব্যবস্থার কোনো মূল্য নেই। যদি সরকার মনে করে সকালে ধরে, বিকেলে খরচা করবে, সেটাই স্পষ্টভাবে ঠান্ডা মাথায় খুনের সমতুল্য।'

প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশি বর্ণনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছে ঘটনাস্থল এবং সময়ের সম্পর্কে অসঙ্গতি রয়েছে; বিশেষত কেন পুনর্নির্মাণ গোপনে রাতের অন্ধকারে করা হলো;এটি সন্দেহ বাড়িয়েছে। সুজাতভদ্র অভিযোগ তুলেছেন যে, বহু ক্ষেত্রে পুলিশ 'পুনর্নির্মাণ' নামে দিনের বেলায় বিরোধী দলের নেতাদের প্রকাশ্যে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরায়; কিন্তু বারুইপুরে রাতের সংঘঠিত পুনর্নির্মাণে গোপনীয়তার মাত্রা দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি অনৈতিক কৌশল এবং ঘটনা যুগপৎভাবে গড়ে তোলার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র আরও উল্লেখ করেছেন, 'একজন নরকের কীটকেও পুলিশের অধিকার নেই মুছে দেওয়ার। পুলিশ গুলি চালালে তাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করতে হবে। আদালতে পুলিশকে প্রমাণ করতে হবে তারা নির্দোষ বা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে।' তিনি বস্তুত জোর দিয়ে বলেছেন, যদি সমাজ পুলিশি খুনকে বৈধতা দেয়, তবে তার পরিণতি ভয়ংকর হবে;নাগরিক আস্থার পুঞ্জিভূত ক্ষতি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পতন অনিবার্য।

আইনজ্ঞরা বলছেন, অভিযোগ গ্রহণযোগ্য মনে হলে অভিযুক্ত পুলিশের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা উচিৎ। তারা সুপারিশ করেছেন যে, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট, ফরেনসিক বিশ্লেষণ, সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল লোকেশন ডেটা এবং প্রত্যক্ষদর্শী'র বিবৃতি দ্রুত সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ তদন্তে পাঠানো হোক। পুলিশ যদি আদালতে 'আত্মরক্ষা' যুক্তি উপস্থাপন করে, তাদেরই প্রমাণের ভার বহন করতে হবে এবং ফরেনসিক উপাত্ত ও দৃশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখাতে হবে।

এমন অনিয়ন্ত্রিত 'দ্রুত ন্যায়বিচার' ও এনকাউন্টার প্রথা দেশের অন্যান্য রাজ্যেও বহুবার সমালোচিত হয়েছে। বারুইপুর ঘটনা সেই একই প্যাটার্নের প্রতিচ্ছবি হলে তার অর্থ শুধু একক অপপ্রচেষ্টা নয়;এটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বেআইনি কার্যকলাপের সংকেত বহন করে। স্থানীয় রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংগঠন ও জনগণের পক্ষ তৎক্ষণাৎ নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে এবং উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত বা স্বতন্ত্র ফের ফরেনসিক কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত শান্তি আশা করা যাবে না বলেও জনগণ মত প্রকাশ করেছেন।

পুলিশ সূত্রের তরফে বলা হয়েছে, ঘটনার সময় অভিযুক্ত আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই গুলি চালায়; কিন্তু পরিবারের সদস্য ও প্রত্যক্ষদর্শীরা এ বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঘটনার পরিবেশনা ও

সময়কে কেন্দ্র করে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রতিবেদনে প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া দরকার;যে সমস্ত প্রমাণাদি রয়েছে তা অবিলম্বে উন্মুক্ত করা হোক এবং বিচারপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হোক।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিবেচনায় সুজাত ভদ্র সতর্ক করেছেন যে, এই ধরনের ঘটনা যদি উপেক্ষিত হয়ে যায়, তাহলে জনগণের মধ্যে আইনের প্রতি আস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, মানবাধিকার আন্দোলন জোরালো হবে এবং রাজনৈতিক মঞ্চ উত্তপ্ত হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন;'পুলিশের খুন সমাজ যদি মেনে নেয়, এর থেকে ভয়ানক কী হতে পারে?'

ঘটনার পুরো বিবরণ এখনও তদন্তাধীন; পুলিশি বর্ণনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে সেগুলি পরিকল্পিতভাবে বা কৌশলে ঘটানো হয়েছে কি না;সেটি প্রমাণ না মিললে তদন্তের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা উচিত। প্রমাণ মিলে গেলে আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে; আর পুলিশের বর্ণনা সত্য প্রমাণিত হলেও স্বচ্ছতা বজায় রেখে দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে প্রমাণাদি আদালতে উপস্থাপন করা অপরিহার্য।

সঙ্ঘ পরিবার ও নেতাজি

শুভ মিত্র

বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীদের গুন্ডা বলছেন।এই কথা বলার জন্য আর যাইহোক শমীক বাবু কে বেইমান বলা চলে না, বা তিনি আর্দশের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন বলা যায় না। বড় জোর বলা চলে সাহসের অভাবে যে কথা এত দিন বলতে পারেননি , এখন ক্ষমতায় এসে,আগে পেছনে পুলিশ থাকায় বুকে বল পেয়েছেন ,তাই বলেছেন।

পরোক্ষ ভাবে বলেছেন নেতাজী কে নিয়ে। কবি নজরুল নেতাজী কে নিয়ে লিখেছেন—

'সে দিন নীশিথ বেলা
যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা
সে তো আর ফিরিল না কূলে
তারি লাগি আঁখি মুছি আর রচি গান
আজিও বিনিদ্র জাগি'

এ অপেক্ষার বিনিদ্র রজনী জাগরন, আর চোখের জল ফেলা আজও সমানে চলেছে যে মহামানবের জন্য সেই সুভাষ বোস আজ গুন্ডাদের সর্দার ? বিট্রিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ,আসুমদ্র হিমাচলের নয়নের মনি, যার উদাত্ত আহ্বানে...

'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'— সাড়া দিয়ে হাজার হাজার যুবক যুবতী বুকের রক্ত ঢেলে স্বাধীনতা সংগ্রামেএগিয়ে এসেছিল, সেই নেতাজী আজ গুন্ডা ?

সুভাষ বোস কে দেশনায়ক পদে বরন করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিভাষনে বললেন ,.....

'সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।... দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্ন কে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভব কে তুমি একান্ত সত্য বলে মাননি। তোমার এই চরিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।'

ভারত মায়ের এই দামাল ছেলের কথা বলে শেষ করা যাবে না ,বা তিনি কত বড় এই মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আমার নেই।

কিন্তু শমীক বাবু একথা বললেন কেন? স্লিপ অফ টাঙ্ক ? কখনোই না। তিনি কি অশিক্ষিত ? না তাও নন। অসচেতন ভাবে বলে ফেলেছেন? এক্কেবারে না। তিনি সচেতন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বলেছেন। তিনি যে রাজনীতি করেন , যে আর্দশে বিশ্বাস করেন তার সঙ্গে নেতাজীর রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা মেরুর।

যেমন সুভাষ বোস বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রের বা রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম কে মেলানো যাবে না ,ধর্ম ব্যাক্তির ব্যাক্তিগত ব্যাপার। এই বিশ্বাস তাঁর জীবন ও কর্মে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে।আজাদ হিন্দ ফৌজের হিন্দু ও মুসলমান সেনাদের জন্য আলাদা রান্নাঘরের পরিবর্তে এক জায়গায় রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর March song, গীতা,কোরান, বাইবেলের শ্লোক নিয়ে করা হলে তিনি বিরক্ত হন এবং সাবধান করে বলেছিলেন ধর্ম দিয়ে যদি মেলাতে চাও, তবে ধর্মের জন্যই একদিন ভাগ হয়ে যাবে। এমনকি দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু মহাসভা , মুসলিম লিগ সহ আরো কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি বলতে শুরু করল হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ আলাদা ফলে উভয় সম্প্রদায়ের জন্য চাই আলাদা দেশ। তখন নেতাজী স্পষ্ট করে করে বলেছিলেন হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ আলাদা নয়। একজন মুসলমান চাষীর সঙ্গে এক জন হিন্দু চাষীর কোনো পার্থক্য নেই। বরং একজন গরীব মুসলমানের সাথে এক জন বড়লোক মুসলমানের পার্থক্য অনেক বেশি। নেতাজীর রাজনীতি বা মতাদর্শের সঙ্গে শমিক বাবুদের রাজনৈতিক ও আর্দশ গত বিরোধের জায়গাটা পরিষ্কার।

শমীক বাবুর পূর্ব পুরুষ হিন্দু মহাসভা ,আর এস,এস পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি বরং বলা ভালো বিরোধীতা করেছেন। তার বহু ঐতিহাসিক প্রমান ,দলিল, বক্তব্য আছে। ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকা কালীন দুই ছাত্র ইংল্যান্ডের পতাকাকে স্যালুট না করায় বেত্রাঘাতের আদেশ ও বহিষ্কার করেছিলেন । ,,আগষ্ট বিপ্লবকে আটকানোর জন্য ছোট লাটকে চিঠি লিখেছেন এবং এতদূর পর্যন্ত বলেছিলেন ....আমরা আপনাদের সাহায্য করবো , আপনারা ঠেকান।

৪২ এর ভারত ছাড়া আন্দোলন কে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী বিশৃংখলা বলে অভিহিত করেছিলেন। আবার নেতাজি ঝাড়গ্রামের সভা থেকে হিন্দু মহাসভা কে বয়কট করার ডাক দিয়েছিলেন। ফলে এদের রাজনৈতিক অবস্থান দুই মেরুর। এরকম বহু প্রামাণ্য ঘটনা আছে।

ফলে হিন্দু মহাসভা ,আর এস এস তখন থেকেই নেতাজী সহ বিপ্লবী ,স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের প্রতি কুৎসা রটনা ,চরিত্র কে কালিমালিপ্ত করার হীন চেষ্টা করে আসছে ।সেই পূর্বসূরীদের রক্ত শমীক বাবুদের ধমনীতে প্রবহমান বলে বলতেই হয় যে তিনি রক্তের সঙ্গে বেইমানি করেন নি। বাঙালি তথা দেশবাসী তাদের প্রিয় নেতার প্রতি এই অবমাননাকর ভাষা প্রয়োগ বরদাস্ত করবেন কি করবেন না এটা আলাদা ব্যাপার।

কিন্তু আমার বলার জায়গা হচ্ছে..... অবস্থান পরিষ্কার করার। শমীক বাবু ও তাঁর দল বিজেপি ক্ষমতা থাকলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করুক যে হিন্দু মহাসভা/বিজেপি/আর এস,এস স্বাধীনতার সংগ্রামের বিরোধী ছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরোধী ছিল এবং তত্ত্বগত ভাবে এখনও তাই আছে। তাঁরা স্পষ্ট করে বলুন দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান মানি না। আমাদের আদর্শ , রাজনৈতিক লাইন এই রকম এই রকম এবং এই রকম ।

মনে এক আর মুখে এক কেন বাপু? নেতাজী কে নিয়ে আদিখ্যেতা করবো ,মহাত্মা গান্ধীসহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গলায় মালা দেব আবার মহাত্মার খুনী গডসে ও শ্যামাপ্রসাদের গলায় মালা দেব এ কেমন দ্বিচারিতা? পক্ষ নিতে হয় শমিক বাবু ।পক্ষ নিন।

তহমীনা খাতুন স্মারক বক্তৃতা :
উচ্ছেদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক উচ্ছেদ

অপর্ণা চক্রবর্তী

গত ৫ জুলাই ২০২৬ গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাগৃহের রেখা দাঁ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো তহমীনা খাতুন তৃতীয় স্মারক বক্তৃতা। এর আগে ২৯ জুন ছিল লেখিকা ও সমাজকর্মী তহমীনা খাতুনের ৬০তম জন্মবার্ষিকী। একই দিনে স্মরণ করা হয় বিজ্ঞান লেখিকা ও শিক্ষিকা রেখা দাঁর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী এবং শুটিয়া গ্রামের প্রতিবাদী যুবক শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের শহীদ দিবস। অনুষ্ঠানের শুরুতে তাঁদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক ডা .ভবানীপ্রসাদ সাহু। মূল আলোচনার বিষয় ছিল 'উচ্ছেদের রাজনীতি, রাজনৈতিক উচ্ছেদ'। আলোচনায় অংশ নেন মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র, হকার্স সংগ্রাম সমিতির সম্পাদক শক্তিমান ঘোষ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সাংবাদিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, মানবাধিকার কর্মী রুপশ্রী রায় এবং বন্দী মুক্তি কমিটির সম্পাদক ছোটন দাস।

সুজাত ভদ্র তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন হকার উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের আইনগত দিক। তিনি উল্লেখ করেন ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০২৬ সালের আদালতের রায়, যেখানে হকারদের জীবিকা নির্বাহের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। সাম্প্রতিক মে ২০২৬-এর কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে;আইন প্রয়োগে বহু মানুষের ক্ষতি হলে তা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। তিনি স্মরণ করান অপারেশন সান শাইন (১৯৯৬)-এর অবৈধ ও অনৈতিক চরিত্র এবং রাজনৈতিক উচ্ছেদের নানা প্রবণতা। হকার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শক্তিমান ঘোষ পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝান দেশের প্রায় ৭৭ু মানুষের দৈনিক ক্রয়ক্ষমতা ২০ টাকার নিচে, যারা হকারদের ওপর নির্ভরশীল। প্রায় ৪ কোটি হকার ৮০ কোটি মানুষের প্রয়োজন মেটান। তিনি বলেন, হকাররা শহুরে অর্থনীতির অপরিহার্য অংশ হলেও কর্পোরেট মুনাফার লড়াইয়ে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সাংবাদিক ও লেখক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বিশ্লেষণ করেন রাষ্ট্রের চরিত্র, সামগ্রিক সমাজচিত্র ও প্রতিকারের উপায়। বন্দী মুক্তি কমিটির সম্পাদক ছোটন দাস উদ্ধৃত করেন জ্যঁ জেকবের 'Eyes on the Street;'হকাররা সিসি টিভির থেকেও বেশি নিরাপত্তা দেয়।'

প্রত্যেক বক্তার তথ্যবহুল বক্তব্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। প্রশ্নোত্তর পর্বে সকলে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। শিক্ষাবিদ প্রাণতোষ

বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেন;উচ্ছেদ শুধু গরীব মানুষের নয়, উচ্ছেদ হচ্ছে ইতিহাসও। প্রসঙ্গ ওঠে সোহরাওয়ার্দি এভেনিউর নাম পরিবর্তন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ পেশ করেন মানবাধিকার কর্মী, রূপশ্রী রায়। স্বাগত ভাষণ দেন বিজ্ঞান লেখক দীপক কুমার দাঁ, সভাপতির ভাষণ দেন ভবানীপ্রসাদ সাহু এবং ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমবায় আন্দোলনের কর্মী কালিপদ সরকার।

তহমীনা খাতুন ছিলেন এক তআগুন পাখিদ। মানুষ ও প্রকৃতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি আজীবন লড়েছেন। তাঁর স্মরণে উচ্ছেদের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই স্মারক বক্তৃতা ছিল যথার্থই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রাস্তার নাম বদল ও ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা

সুশান্ত দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গত ২৩ জুন রাজ্য বিধানসভায় রাস্তার নাম বদল প্রসঙ্গে বলেছেন ‘সুরাবর্দীর নাম থাকবে কেন ? পাঁচটা গুলি চালিয়েছিলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামী , সেই বীণা দাসকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তৎকালীন উপাচার্যকে (হাসান সুরাবর্দী) নাইট উপাধি দেওয়া হয়েছিল।’ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য জেনে মনে হল তিনি এই রাস্তা প্রাক্তন উপাচার্য হাসান সুরাবর্দীর নামে ছিল বলে জেনেছেন। সমস্যা এখানেই ।কলকাতা কর্পোরেশন কোনও খোঁজখবর না করেই সোহরাবর্দী (সূরাবর্দী) এভিনিউ - এর নাম পরিবর্তন করে গোপাল মুখার্জী’ র নামে নামাঙ্কিত করেন । ১৯৪৬ এর ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগ আহুত ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডের সমাবেশ থেকে কলকাতায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এই ঘটনার জন্য তৎকালীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সূরাবর্দী বহুল নিন্দিত হন।এই দাঙ্গার জন্য অনেকে তাঁকে দায়ী করেন। তাই তাঁর নামে রাস্তা রাখা যাবে না । পরে শাসক দল জানলেন যে রাস্তা প্রধানমন্ত্রী সূরাবর্দীর নামে নয় তাঁর মামার নামে, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ছিলেন (যদিও এই জানাটাও সঠিক নয়)। তখন তো ভুল স্বীকার করা যেত ।না ওই পরিবর্তনই স্ট্যান্ড করবে ।তার কারণ রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছে গোপাল মুখার্জি‘র নামে, যিনি গোপাল পাঠা নামে সমধিক পরিচিত । তাঁর একটি পারিবারিক মাংসের দোকান ছিল। ১৯৪৬ এর দাঙ্গার সময় গোপাল বাবু একটি সুরক্ষা বাহিনী গঠন করে তাঁর বাসস্থান মলঙ্গা লেন ও সংলগ্ন এলাকায় মুসলিম লিগের বিপরীতে দাঙ্গা প্রতিরোধ করেন।স্বাধীনতার পর তিনি কংগ্রেসের আশ্রয়ে ছিলেন। কোনও বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্বপালন করতে তাঁকে দেখা যায়নি। সঙ্ঘ পরিবার তাঁকে এখন হিন্দু ধর্মের গৌরব রক্ষার এক মহান সেনাপতি বলে মনে করেন।

ওই রাস্তার নাম সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য হল ১৯৩৩ সালে যখন পার্ক সার্কাসের পঞ্চম রাস্তাটির নামকরণের প্রস্তাব আসে তখন রাস্তাটির নামকরণ করা হয় উপাচার্য হাসান সুরাবর্দীর বাবা মৌলানা ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দীর নামে। যখন নামকরণের প্রস্তাব হয় তখন হাসান সুরাবর্দী উপাচার্যের পদে আসীন।জীবিত ব্যক্তির নামে কোন কিছুর নামকরণ আমাদের দেশের প্রথা নয়। তিনি মারা যান ১৯৪৬ সালে। অজিত কুমার বসু তাঁর দুখণ্ডের ‘ কলিকাতার রাজপথ ‘ বইতে উল্লেখ করেছেন নতুন রাস্তা ‘ সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ ‘ নামে নামাঙ্কিত হয় মৌলানা ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ারর্দী (সুরাবর্দি)’র নামে। তিনি ছিলেন সাধু প্রকৃতির মানুষ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত। ১৯৩৩ এর ৮ই মার্চ এই নামকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এক ব্রাহ্মণ সন্তান। তাঁর নাম শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। হিন্দু - মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । তখন ডা. বিধান রায় কলকাতার মেয়র।তিনি এই প্রস্তাব কার্যকর করেন।

কিন্তু কে ছিলেন মৌলানা ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী ? তিনি ছিলেন মেদিনীপুর শহরের বিখ্যাত সোহরাওয়ার্দী পরিবারের কৃতী সন্তান ।আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর দেশের মানুষ ।ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী(১৮৩২-১৮৮৬) ছিলেন বহু ভাষাবিদ ।উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দি রাজা রামমোহন রায় রচিত একেশ্বরবাদ বিষয়ক গ্রন্থ ‘ তুহফাত উল মুবাহহিদ্দিন ‘ অনুবাদ করেন । তাঁর A Gift to the Deist ছিল মূল্যবান গ্রন্থ ।তিনি ছিলেন হুগলি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট । ভাষাবিদ হরিনাথ দে ঢাকা কলেজে তাঁর প্রতিকৃতি আঁকিয়ে রেখেছেন। তিনি ঢাকায়, দুটি সংস্কারবাদী এবং সম্প্রদায় উন্নয়ন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন । উবায়দুল্লাহ উর্দু, আরবি, ফারসি ও ইংরেজিতে বই লিখেছেন এবং বহু রচনা অনুবাদ করেছেন। তাঁর সন্তান হাসান সোহরাওয়ার্দী (সুরাবর্দী) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম উপাচার্য (১৯৩০-১৯৩৪) এবং ইংল্যান্ডের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস-এর ফেলো হওয়া উপমহাদেশের দ্বিতীয় মুসলিম ছিলেন। হাসান সোহরাওয়ার্দী বেঙ্গল

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন, যেখানে তিনি ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত উপ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের প্রধান চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসেবে তিনি রেলওয়ের অ্যাম্বুলেন্স ও নার্সিং বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। একথা সত্য তিনিও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতন ইংরেজদের অনুরক্ত ছিলেন।

মৌলানা ওবায়দুল্লাহ সোহরাবর্দীর কন্যা খুজিস্তা আখতার বানু ছিলেন অতি উচ্চ শিক্ষিতা।১৯৪৬ এর দাঙ্গার সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) বহু নিন্দিত হোসেন শহিদ সুরাবর্দী ছিলেন খুজিস্তা আখতার ও ব্যারিস্টার জাহিদ সুরাবর্দীর পুত্র ।অর্থাৎ তিনি মৌলানা ওবায়দুল্লাহর দৌহিত্র। তাঁর নামের সঙ্গে সুরাবর্দী অ্যাভিনিউ এর কোনও সম্পর্ক নেই।

হাসান সোহরাবর্দী (সুরাবর্দী) যখন উপাচার্য তখন ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বিপ্লবী বীণা দাস অভিজ্ঞান পত্র নেওয়ার সময় তাঁর গাউন এর ভিতর থেকে রিভলভার বার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য তথা বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন ।পুলিশ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করে । বীণা দাস তাঁর আত্মকাহিনি ' শৃঙ্খল ঝঙ্কার '- এ উপাচার্য হাসান সোহরাবর্দী তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছেন এরকম কোনও কথা লেখেন নি । বীণার একান্ত অনুরোধে যুগান্তর দলের নেত্রী কমলা দাসগুপ্ত তাঁকে রিভলভারটি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। বীণা অস্ত্রটি পেয়ে প্র্যাকটিস করার কোনও সুযোগ পাননি ।পরে তাঁরা দুজনে একত্রে হিজলি জেলে বন্দি ছিলেন । কমলা দেবী তাঁর ' রক্তের অক্ষরে ' গ্রন্থে উপাচার্য বীণাকে ধরিয়ে দিয়েছেন এমন কোনও কথা লেখেননি । বীণা দাসের দিদি স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্যাণী দাসও আগে থেকে হিজলিতে বন্দি ছিলেন । তাঁরা দুজনে ছিলেন স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের কণ্যা । কল্যাণী দেবীও তাঁর ' জীবন অধ্যয়ন ' গ্রন্থে ওই উপাচার্য সম্পর্কে আদৌ কোনও কথা লেখেন নি ।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন ' মোগল পাঠান অত্যাচারী ব্রিটিশদের নামে কলকাতায় কিছুর নাম থাকবে না ।' কোনও অত্যাচারী ব্রিটিশদের নামে কলকাতায় কোনও কীর্তির নাম আছে কি ? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তো তৎকালীন ভারতেশ্বরীর নামে । কত অত্যাচারী শাসকরা তাঁর আদেশে ভারত শাসন করেছেন ।এখন কি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নাম পরিবর্তন করা হবে? আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোগল পাঠান বলতে কি বুঝিয়েছেন তা জানবার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে । আমাদের দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিতে পাঠান সুলতানদের আমলে যে উৎকর্ষতা অর্জিত হয়েছে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। মধ্যযুগের অন্যতম বিশিষ্ট নিদর্শন অনুবাদ সাহিত্য। পনের শতকের শেষার্ধে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর সভাকবি কৃত্তিবাস কর্তৃক সংস্কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে এ ধারার সূত্রপাত এবং মহাভারতের ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে তা সম্প্রসারিত হয়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এ পর্যায়ের বিশিষ্ট গ্রন্থ । তবে সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রথম মহাভারত অনুবাদ করেন যা 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত। পরাগল খাঁর ছেলে ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী 'ছুটি খানি মহাভারত' রচনা করেন।

দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁহার 'বৃহৎ বঙ্গ ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে বাংলা ভাষা, সাহিত্য , গীতিকাব্য , লোক সঙ্গীতের বিকাশে পাঠান সুলতানদের অবদানের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন।মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের কথা উল্লেখ করেছেন। ওই সময়ে হিন্দুদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথাও তাঁর বর্ণনায় পাওয়া যায় (পাঠান রাজত্ব সম্পর্কে নানাকথা ,তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৬৪৯ - ৬৭৪)।লেখাটি বড় হয়ে যাবে বলে উদ্বৃতি দেবার লোভ সংবরণ করলাম।

তিব্বত - বর্মী ভাষা গোষ্ঠীর আরাকান রাজ্যের রাজসভায় বাঙালি মুসলমান কবিরা খুবই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।এঁদের মধ্যে খ্যাতনামা দৌলত কাজী ও আলাওল। ব্রহ্মদেশের রাজার দ্বারা সিংহাসন হারিয়ে আরাকান রাজ নর্মেইখলা বাংলার পাঠান সুলতানের আশ্রিত হয়ে (১৪০৪ সাল)বাংলায় ছিলেন। তিনি বাংলা শেখেন ও এই ভাষাকে ভালোবেসে ফেলেন। তিনি নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে উৎসাহের সঙ্গে এই বাঙালি মুসলমান কবিদের দরবারে স্থান করে দেন ও কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। তাঁদের বিশিষ্ট রচনা লোর চন্দ্রানি, সতি ময়না ও পদ্মাবতী কাব্য প্রভৃতি।

আচার্য ক্ষিতি মোহন সেনশাস্ত্রী তাঁর ' ভারতে হিন্দু - মুসলমানের যুক্ত সাধনা ' গ্রন্থে লিখেছেন 'বাংলাদেশেও হিন্দু - মুসলমান সাধনার কম যোগ হয় নাই।বহু মুসলমান বৈষ্ণব কবি তো আছেনই।তাহা ছাড়াও মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ, বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে মুসলমান উৎসাহদাতার অভাব হয় নাই।তাহার উপরে আউল -বাউল- দরবেশদিগের অপূর্ব সঙ্গীত সাহিত্য (পৃষ্ঠা - ৩১১)।' চট্টগ্রামের শ্রদ্ধেয় আব্দুল করীম সাহিত্য বিশারদ মহাশয় বাংলাদেশের বহু মুসলমান বৈষ্ণব কবির পরিচয় দিয়েছেন।

মধ্যযুগে দেশজুড়ে ভক্তি আন্দোলনের যে এক প্রবল জোয়ার এসেছিল তা ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাতাদের চোখে পড়ে না।মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের এই সাধকরা সকলেই ধর্ম ও জাতপাতের গণ্ডি অস্বীকার করে সম্প্রীতির বাণী প্রচার করেছিলেন। এঁরা হলেন নানক, কবীর , শ্রী চৈতন্যদেব , দাদু , রজ্জব , রামানন্দ , নামদেব, তুকারাম, নরসিংহ দাস প্রমুখ অসংখ্য সাধক।হিন্দু - মুসলমানের মিলনের কথা এই নিরক্ষর সাধকের দলই বললেন। পন্ডিতরা বলতে পারলেন না। কারণ পন্ডিতরা সব ইঁট পাথর। কবীর লেখেন— 'ইঁটা ইঁটা আগ হৈ কাদো কাদো লাগ ' দুই দিকের ইঁট পাথরের ঠোকাঠুকিতে আগুন জ্বলে , মূর্খ সহজে কাদায় কাদায় লাগিয়া যায়। ' ' পড়হি পড়হী তো পথর ভয়া লিখি লিখি ভয়া জো ইঁট'

পন্ডিতেরা শাস্ত্র পড়ে পাথর হয়েছেন, লিখে লিখে তাঁরা নিরস দগ্ধ ঝামা বনেছেন। মধ্যযুগে মোগল আমলে 'ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা ' র ফলে স্থাপত্য , সাহিত্য, হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, চিত্রকলা , উদ্যানবিদ্যা , সমুদ্রবিদ্যা , শিল্প ও বানিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছিল। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী এই বিষয়ে লিখিত তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

কবিগুরু লিখেছিলেন ' শক হুন দল পাঠান মোগল , এক দেহে হল লীন '। কবিগুরু এই ইতিহাসকেই তাঁর ভারততীর্থ কবিতায় তুলে ধরেছেন ।এই ইতিহাস কি পাল্টানো যাবে ?

স্মরণ

তিজন বাঈ

প্রখ্যাত পাণ্ডবানী সঙ্গীতশিল্পী ডঃ তিজনে বাঈ দীর্ঘদিন অসুস্থতার সাথে লড়াই করার পর ৫ই জুলাই (রবিবার) রায়পুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (বয়স ৭০ বছর)। তিনি সেল (SAIL)-এর ভিলাই ইস্পাত কারখানার একজন কর্মী ছিলেন। তিনি ভারতের একমাত্র মহিলা যিনি তিনটি পদ্ম পুরস্কারেই ভূষিত হয়েছেন ; পদ্মশ্রী (১৯৮৭), পদ্মভূষণ (২০০৩) এবং পদ্মবিভূষণ (২০১৯)।

তিজন বাঈ ছিলেন একজন প্রখ্যাত লোকশিল্পী, যিনি ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প 'পাণ্ডবানী';যা মূলত হিন্দু মহাকাব্য মহাভারতের একটি সুরেলা বর্ণনা;একে ছত্তিশগড়ের গ্রামীণ উঠোন থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শক্তিশালী কণ্ঠস্বর, প্রাণবন্ত গল্প বলার শৈলী এবং তাঁর চিরপরিচিত তারের বাদ্যযন্ত্র (তম্বুরা) সহযোগে মুগ্ধকর মঞ্চ উপস্থিতির জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন। পান্ডবানী হল লোকগান ও লোকনাট্যের এক যুগল সম্মিলন। মাত্র একজন কুশীলব কাহিনির অন্তর্গত সমস্ত চরিত্রের রূপায়ণ করেন। মূল কাহিনির উপস্থাপনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে সামান্য কিছু যন্ত্রানুষঙ্গের সাহায্য নেওয়া হয় বটে, তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভিনয়দক্ষতা, বাচনভঙ্গি, ঋজু পরিবেশনই পান্ডবনিতে প্রধান হয়ে ওঠে। অভিনেতা বা অভিনেত্রীর হাতে থাকা তম্বুরা বা তানপুরা এখানে খুব বড় ভূমিকা নেয়। ওই একান্ত দেশজ তারযন্ত্রটিই হল নাটকের অভিনেতা বা অভিনেত্রীর একমাত্র সহায়ক উপকরণ। অভিনয়ের সময় ওই তম্বুরাই কখনও হয়ে ওঠে অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু, কখনও-বা মধ্যমপাণ্ডবের হাতের গদা, কখনও-বা শ্রীকৃষ্ণের মুরলী। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে শরীরের বিচিত্র অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য প্রক্ষেপণ-কুশলতা। তিজন বাঈ এই লোকনাটকের অভিনয়ের সমস্ত ক্ষেত্রেই অসামান্য পারঙ্গমা ছিলেন। আর তাই তাঁর খ্যাতিতে ভর করে পান্ডবানী হয়ে উঠেছিল মনোরঞ্জনের এক আশ্চর্য উপস্থাপন।

ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বজুড়ে শ্রোতাদের তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন।

তিনি বিশ্ব মানচিত্রে ছত্তিশগড়কে এক বিশেষ পরিচিতি এনে দিয়েছেন।

১৯৫৬ সালের ২৪ এপ্রিল ভিলাই থেকে কিছুদূরের নিলগতর গনিয়ারি গ্রামের এক পাদ্রি সম্প্রদায়ভুক্ত তফসিলি জনজাতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিজন। বাবা চুনুক লাল ও মা সুখবতী দেবী। তিজন ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের জ্যেষ্ঠা সন্তান। বাড়ির আবহাওয়ায় পান্ডবানীর ধারা বহমান ছিল। তাই খুব ছোটবেলা থেকেই একটু একটু করে মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করেছিলেন তিনি। পাদ্রি সমাজের রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক আবহে মহিলাদের নিজেদের ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সেকালে ছিল না। অথচ তিজন সেই নিষেধের বেড়া ভেঙে নিজেকে মেলে ধরতে উন্মুখ ছিলেন। পান্ডবানী করার অপরাধে একসময় তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়। কিন্তু তিনি দমে যাননি। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিজনের বিবাহ হয়, যদিও প্রথম স্বামীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন মোটেই সুখকর হয়নি। পরবর্তী সময়ে তিনি টুক্কারামকে বিবাহ করেন।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজভাবনার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যে পান্ডবানী উপস্থাপনের জন্য তিজনকে একসময় সামাজিক বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছিল, সেই রক্ষণশীলতায় বদল এসেছে ১৯৮০ সালের পর থেকেই। এই পরিবর্তনের পেছনে তিজন বাইয়ের ভূমিকা ছিল অনন্য। তাঁর একরোখা অদম্য লড়াইয়ের ফলেই হয়তো এই বদল সম্ভবপর হয়েছিল একটু একটু করে। একচেটিয়া পুরুষ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিজন ছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি, এক হার-না-মানা সংগ্রামের প্রতীক। তাঁকে প্রণাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—সোমনাথ মুখোপাধ্যায়,
৪ নং প্ল্যাটফর্ম।

সুমিতা দে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের এডিশনাল ডাইরেক্টর অফ ইনফরমেশন ও চিফ অফ নিউজ ব্যুরো (বার্তা শাখা প্রধান) সুমিতা দে গত ২ জুলাই, ২০২৬ রাতে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে দেশ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তাঁর মৃত্যু সংবাদে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মী ও আধিকারিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। তিনি দীর্ঘদিন রাজ্য সরকারের বার্তা শাখায় কাজ করেছেন ও প্রধান হিসাবে ওই শাখার দায়িত্ব সামলেছেন। এই কাজের সূত্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল । কলকাতা প্রেস ক্লাব তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে।

সুমিতা দে লোরেটো স্কুলের কৃতি ছাত্রী । তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মাস্টার ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি রাজ্য সরকারের জুনিয়র ইনফরমেশন সার্ভিসে যোগ দেন । পরবর্তী সময়ে পদোন্নতির মাধ্যমে তিনি স্টেট ইনফরমেশন সার্ভিসে যোগ দেন । তিনি দীর্ঘ দিন তথ্য বিভাগের প্রদর্শনী শাখারও দায়িত্ব সামলেছেন। কোভিডের সময় কোভিড যোদ্ধা হিসাবে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সাংবাদিকদের টিকাকরণ কর্মসূচি পালন করার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সাংবাদিকদের পেনশন স্কিম কার্যকর করবার জন্যও তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কিছুদিন ডেপুটেশনে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিউটেড কর্মরত ছিলেন । সেখানেও তিনি অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করেন।

নাগরিক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী সুমিতা দে'র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে ও তাঁর পরিবার এবং সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

শান্তনু দত্ত চৌধুরীর সংযোজন : সুমিতার সঙ্গে তথ্য সংস্কৃতি বিভাগে একসঙ্গে কাজ করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ' দুর্লভ ' বললাম এই কারণে যে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সময় তাঁর বিরল গুণাবলির পরিচয় আমি পেয়েছি। যে কোনও কাজে তাঁর দায়িত্ববোধ, পারদর্শিতা ও নিষ্ঠা ছিলো শেখার মতন। তথ্য বিভাগে প্রতিদিনই অসংখ্য সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ নিতে এসে থাকেন। সুমিতার কাছে এলে বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে সে তাঁদের সাধ্যমতন সহায়তা করতো। সাধারণ মানুষকে সাহায্য করে সে আনন্দ পেতো। দূরতম জেলার ক্ষুদ্রতম সংবাদপত্রের অনেক সাংবাদিকদের সে চিনত। তাঁদের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড রিনিউ করার বিষয়ে সর্বদা সহায়তা করত। তাঁর ব্যবহারে ছিল ব্যক্তিত্ব ও একই সঙ্গে সৌজন্য। ইনফরমেশন ও কালচার ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সংগঠনের সম্পাদকের দায়িত্ব আমাকে কিছুদিন সামলাতে হয়েছিল। তখন আমি সুমিতাকে সংগঠনের অফিস সেক্রেটারি হিসেবে পেয়েছিলাম । তখন সেই কাজেও তাঁর পারদর্শিতা ও নিষ্ঠা আমি দেখেছি। ওই বিভাগের অফিসারদের সার্ভিস এখন আরও এক্সপ্যান্ড করেছে , যাতে সুমিতার অবদান আছে। আমি ১৩ বছর হল অবসর নিয়েছি। আমার থেকে অনেক ছোট সুমিতা। সে ওই বিভাগের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর হওয়ায় খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর চলে যাওয়ায় সে আনন্দ ম্লান হয়ে গেল।

তাঁর সরকারি কাজ থেকে অবসর গ্রহণের আর সামান্য কিছুদিন বাকি ছিল । তার আগেই সে জীবন থেকে অবসর নিয়ে বহু দূরের অজানা দেশে চলে গেল।

নাগরিক স্মৃতিচারণা

ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ

আহমেদ ইশতিয়াক

অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, 'রণজিৎ গুহ হলেন বিশ শতকের সবচেয়ে সৃজনশীল ভারতীয় ঐতিহাসিক'। রণ্ওজিৎ গুহকে আসলে ঠিক কতো অভিধায় ব্যাখ্যা করা যায় জানা নেই আমার। তবে এক্ষেত্রে অমর্ত্য সেনের করা উক্তিটিই বোধহয় তাঁর জন্য সবচেয়ে যথার্থ হবে।

যে পরিবারে জন্মেছিলেন রণজিৎ গুহ, সেই পরিবারটি ছিল তালুকদার পরিবার। অথচ সেই পরিবারের সন্তান রণজিৎ গুহ পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, 'বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণি-পরিচিতির গ্লানি আমার মনে গেঁড়ে বসেছিলো।' .কোন মাপের মানুষ হলে একজন মানুষের পক্ষে এমনটা ভাবা সম্ভব ছিল। প্রথম জীবনেই লিখেছেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত' নামক অসামান্য এক প্রবন্ধ।

নিম্নবর্গের মানুষকে তিনি তুলে এনেছিলেন পরম মমতায়। তাঁকে বলা যায় নিম্নবর্গের মানুষদের সবচেয়ে বড় ইতিহাসবিদ। ১৫ বছর বয়সে কলকাতায় এসেই জড়িয়ে পড়েছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হয়েই পেয়েছিলেন অধ্যাপক সুশোভন সরকারের মতো প্রবাদপ্রতিম ইতিহাসবিদের ছায়া। ছাত্রবস্থাতেই ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্ট কনফারেন্সে অংশ নিতে গিয়েছিলেন ফ্রান্সের প্যারিসে। মাত্র ২৪ বছর বয়সে প্যারিসের বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন রণজিৎ গুহ। তাও একবার নয়, টানা সাত- সাতবার।

১৯৫৩ সালে কলকাতায় ফিরে এসে শিক্ষকতা শুরু করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। একইসঙ্গে চালিয়েছেন পিএইচডির থিসিস, কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত আন্দোলন সংগ্রামে তিনি ছিলেন চিরসঙ্গী।

রণজিৎ গুহ যতোটা না কমিউনিস্ট বা বামপন্থী ছিলেন তার চেয়েও ঢের ছিলেন শ্রেণী সংগ্রামী। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন হাঙ্গেরীতে হামলা চালালো। কলকাতায় থাকা দু একজন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ছাড়া বাকি সব বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করেছিলো। সোভিয়েত আগ্রাসনে সবার নীরবতা দেখে প্রতিবাদে দল ছেড়েছিলেন রণজিৎ গুহ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পেছনের তাঁর মতো কেউই এতোটা গভীরভাবে ভাবেনি। লিখেছেন নিম্নবর্গের ইতিহাস কিংবা 'চন্দ্রা'স ডেথ'র মতো অবিস্মরণীয় প্রবন্ধ। নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিলেন মার্ক্সবাদে। ততোদিনে ভারত ছেড়ে থিতু হয়েছেন ইংল্যান্ডে।

তিনি তখন ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। এমন সময়ই তৎকালীন চেকোস্লোভাকিয়ায় আগ্রাসন চালালো সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রতিবাদে সরাসরি পার্টি থেকে পদত্যাগ করে রণজিৎ গুহ বলেছিলেন, 'এখন কোন পার্টিই আর মানবতার কথা ভাবতে চায়না। রাষ্ট্রসমূহ এখন পুঁজিবাদের সমর্থক।' এরপর একটিবারের জন্য ও কোন দলের ছায়া মাড়াননি রনজিৎ গুহ। চিরকালই প্রতিষ্ঠানবিরোধী ছিলেন রণজিৎ গুহ।

১৯৭০ সালে এক বছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন রণজিৎ গুহ। তখন চলছে নকশাল আন্দোলনের দাপট। নকশাল আন্দোলনের ছাত্রকর্মীদের সংস্পর্শ চিরকালের জন্য পাল্টে দেয় রণজিৎ গুহক্যা। তিনি সিদ্ধান্ত নেন কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করবেন। রণজিৎ গুহের করা সেই দীর্ঘ এক যুগের নিষ্ঠা, সাধনা আর অধ্যবসায়ের গবেষণা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিলো 'দ্য এলিমেন্টারি আসপেক্টস অব পেজ্যান্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া'।

রণজিৎ গুহ তাঁর লেখা প্রথম বই 'আ রুল অব প্রপার্টি ফর বেঙ্গল' উৎসর্গ করেছিলেন কিংবদন্তি অধ্যাপক সুশোভন সরকারকেই। তবে একটি জিনিস অদ্ভুত লাগে। সুশোভন সরকারের প্রয়াণের পর প্রকাশিত হয়েছিলো স্মারক গ্রন্থ 'এসেজ ইন অনর অব প্রফেসর এস সি সরকার'। যেখানে ঠাঁই পেয়েছিলো ৪০ জন ইতিহাসবিদের স্মৃতিচারণ। কিন্তু সেখানে নেই রণজিৎ গুহের কোন লেখা। কেন নেই জানা নেই তা।

রণজিৎ গুহের চিন্তার প্রসারতায় জন্ম হলো সাবঅল্টার্ন তত্ত্বের। তাঁর প্রস্তাবিত সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীতে ছিলেন পিএইচডি না করা অসামান্য সব ছাত্ররাও। যেমন শাহিদ আমিন, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়,ডেভিড হার্ডিম্যান, ডেভিড আর্নল্ডের মতো পরবর্তীকালের বিখ্যাত সব ইতিহাসবিদরা। রণজিৎ গুহের এই ছাত্ররাই বিশ্বখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সুউচ্চ পদ দখল করে আছেন।

একসময় পুরোপুরি ইংরজিতে লিখলেও রনজিৎ গুহ উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা লেখার প্রয়োজনীয়তা। ১৯৯৯ সালে নিজেকে বাকি জীবনের জন্য গুটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে। সেখান থেকে একে একে রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, মহাভারত থেকে বিভূতিভূষণের ঋতবাদী ভাবনা ধরা দিলো রণজিৎ গুহের কলমে।

ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, মানবতাবাদ কোনটি আসেনি রণজিৎ গুহের লেখার খাতায়। নিজের জীবনের প্রায় শেষ তিন দশক তিনি কেবল দর্শনের প্রশ্ন নিয়েই লিখে গেছেন।

অষ্টাদশ শতকের লবণচাষীদের দুর্দশা নিয়ে তিনি যেমন লিখেছিলেন অবিস্মরণীয় প্রবন্ধ, 'মেদিনীপুরের লবণশিল্প', ঠিক তেমনি ৫৫ বছর পর সাহিত্যের প্রসঙ্গে লিখেছেন 'ছয় ঋতুর গান'। বাংলার রেনেসাঁ মানব ও সর্বপ্রথলয়্যল লো আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে লিখেছেন, 'রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা'।

রণজিৎ গুহ এমনই এক মানুষ ছিলেন, যিনি সমস্ত কিছুর আগে ঠাঁই দিয়েছেন মানবতাবাদকে। আমাদের ভীষণ সৌভাগ্য যে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই মানুষটিকে ২০০৯ সালে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রিতে ভূষিত করতে পেরেছিলাম।

বরিশাল অঞ্চলের মাটি থেকে আমরা দুই কিংবদন্তী ইতিহাসবিদকে পেয়েছিলাম। রণজিৎ গুহ এবং তপন রায়চৌধুরী। মজার বিষয় হলো দুজনই ছিলেন জমিদার বাড়ির সন্তান। তপন রায়চৌধুরী ছিলেন কীর্ত্তিপাশা জমিদার বাড়ির সন্তান আর রণজিৎ গুহ সিদ্ধকাঠির।.

কিন্তু দুঃখের বিষয় দুজনই হয়েছিলেন দেশভাগের চূড়ান্ত শিকার। তাদের মধ্যে আরেকটি মিল ছিল দুজনই ইংল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। তপন রায়চৌধুরী ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, আর রণজিৎ গুহ সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের। তপন রায় চৌধুরী জীবনের শেষপর্যন্ত অক্সফোর্ডে থাকলেও রণজিৎ গুহ নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে চলে গেলেন ভিয়েনাতে।.

রণজিৎ গুহ কতোটা পরিশ্রমী ছিলেন বোঝা যায় একটি সাক্ষাৎকার পড়লেই। ৯৬ বছর বয়সে এসে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন, 'লেখার অনেকগুলো প্রজেক্ট মাথায় ছিল। যেমন মানিক বাঁড়ুজ্যেকে নিয়ে একটা বই লেখার ইচ্ছে ছিল।'.

আজ থেকে শত বছর আগে আমাদের বরিশালের বাকেরগঞ্জে জন্ম নেয়া এই মানুষটি গোটা দুটি প্রজন্মকে ইতিহাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই মানুষটির প্রতি আমাদের ঋণ কখনো শোধ হওয়ার নয়। জন্মদিনে রণজিৎ গুহের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা!

পুস্তক পর্যালোচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা

বাসু আচার্য্য

২৮ জুন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে এই আলোচনা । ২০১৬ সালে 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশের সার্ধশতবর্ষে অনেকানেক জ্ঞানেন্দ্রিয় উন্মোচনকারী বই ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। জ্ঞানী-গুণীদের মাঝে এই লেখকের উক্ত বিষয়ে একটা (ইংরাজি) বই বেরিয়েছিল, যার নাম 'কপালকুণ্ডলাঞ্চসেলিব্রেটিং ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ইয়ারস'। বইটাকে বঙ্কিম ভবনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রী পিনাকেশচন্দ্র সরকার, 'অমূল্য সংকলন' বলে অভিহিত করেছিলেন, কেননা সেই প্রথম এতদিনের চলে আসা মিথকে ভেঙে 'কপালকুন্ডলা'-র সঠিক পাঠভেদ উপস্থিত করা হয়েছিল এই বইতে।

যাইহোক, উক্ত বইতে পাঠভেদ ছাড়াও আরও নানান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল , নতুন নতুন বহু তথ্য সংযোজিত করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যে কাজটা করিনি, পাঠক মার্জনা করবেন, তা হ'ল তন্ত্র বিষয়ে আলোচনা। 'কপালকুণ্ডলা' পড়লে বোঝা যায় বঙ্কিম তন্ত্র সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন, এবং বেশ গভীরভাবে তার পাঠ নিয়েছিলেন। অনেক পরে, 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার পাতায় যখন তিনি শোভাবাজার রাজবাড়ির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে উইলিয়াম হেস্টির সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন ও সেখানে মাঝখান থেকে ঢুকে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় অযাচিতভাবে অভিযোগ আনেন যে বঙ্কিম তান্ত্রিক মত ও পথকে হিন্দুধর্মের মূল আধার রূপে বর্ণনা করছেন, তখন বঙ্কিম কৃষ্ণমোহনের ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলেন, 'লেট তন্ত্র পেরিশ, বাট লেট ইট নট পেরিশ আনস্টাডিড।' এই শেষ কথার যে কী অপরিসীম মূল্য তা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝবেন।

যাই হোক, বঙ্কিমের তন্ত্র বিষয়ক পড়াশুনা ও শৈব ও শাক্ত তন্ত্র সম্পর্কে ধারণার প্রকাশ দেখা যায় 'কপালকুণ্ডলা'-র নানান অংশে। এমনকি যেখানে তান্ত্রিক কর্তৃক নারীর 'সতীত্বনাশ' প্রসঙ্গে অধিকারী আলোচনা করেছেন (চতুর্থ সংস্করণ), সেখানে হিন্দু তন্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝবেন যে তান্ত্রিক অনুশীলনের 'ম-কার তত্ত্বে'-র একটা বিশেষ আঙ্গিকের সমালোচনাই বঙ্কিমের লক্ষ্য। 'পঞ্চ ম-কার' বা 'ম-কার তত্ত্বে'-র বিবিধ অংশগুলো হ'ল;(১) মদ্য, (২) মাংস, (৩) মাৎস্য, (৪) মুদ্রা এবং (৫) মৈথুন। বলা বাহুল্য, 'সতীত্ব-নাশ' বলতে 'মৈথুন' তত্ত্বের কথাই বলা হয়েছে এবং সে তত্ত্বে কপালকুণ্ডলার পালক কাপালিকের সাধনা যে সিদ্ধ হবে না, তাও বলা

হয়েছে, কেননা অধিকারীর মতে জগতের মা জগদম্বা 'সতীত্বনাশযুক্ত পূজা গ্রহণ করেন না'। বঙ্কিমের পড়াশুনা যে এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট গভীর ছিল তা এই কথাটুকুতেই স্পষ্ট। 'মহানির্বাণ তন্ত্রে' পরিষ্কার বলা হয়েছে;'বিনা পরিণীতাং বীরাঃ শক্তিসেবাং সমাচারন্। / পরস্ত্রীগামিনাং পাপাং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।।' অর্থাৎ নিজের বিবাহিত স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোনো শক্তি গ্রহণ করলে সাধকের পরস্ত্রী গমনের পাপ হবে। কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রে সম্পর্কটা যেহেতু পিতা-কন্যার সেহেতু পালক কাপালিকের মোক্ষলাভ অসম্ভব। এতে কেউ কেউ হিন্দু পুরাণের কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে তর্ক জুড়তে পারেন। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা দরকার যে ফলিত (এখানে ফলিত শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ) তন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে বৈদিক যুগ তো দূরের কথা, ধর্মশাস্ত্রের যুগেরও পরে।

বঙ্কিমচন্দ্র এভাবেই একেবারে খুঁটিতে-নাটিতে নজর রেখেছেন, যতটা পেরেছেন কাপালিককে বাস্তব ক'রে তুলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক অদ্ভুত অসাবধানতাজাত প্রমাদ তাঁর তন্ত্রপোলব্ধিকে কলঙ্কিত করেছে। 'কপালকুণ্ডলা' পড়ুন বা না-পড়ুন, সিনেমা ও টিভি সিরিয়ালের দৌলতে সবাই জানেন যে শব সাধনা হ'ল বৌদ্ধ বা হিন্দু উভয় তন্ত্রেরই একটা সাধন পদ্ধতি। সেক্ষেত্রে স্থান, কাল ও মৃতদেহের নির্বাচন কীভাবে হবে তার সুস্পষ্ট নিয়ম আছে। যাঁরা এ বিষয়ে কিছুটা জানতে চান তাঁরা নিগমানন্দ সরস্বতীর 'তান্ত্রিকগুরু' বই পাঠ করতে পারেন, কেননা নিগমানন্দ, যিনি সম্পর্কে বঙ্কিমের দুঃসম্পর্কের আত্মীয়ও বটে, একমাত্র সন্ন্যাসী যিনি চতুর্মার্গে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন;যার অন্যতম হ'ল তান্ত্রিক মার্গ (তাঁর তান্ত্রিকগুরু ছিলেন প্রখ্যাত তন্ত্র-সাধক বামা খ্যাপা)। 'তান্ত্রিকগুরু'-তে শব নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিষ্কার বলা আছে যে, ব্রাহ্মণের শব কোনোভাবেই সাধনার উপযুক্ত নয়। নিম্নবর্গীয় তপশীলী চণ্ডাল (শূদ্র পিতার ঔরসে ব্রাহ্মণ মাতার গর্ভজাত) শব ছাড়া এই সাধনা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু উপন্যাসে কাপালিক যখন নবকুমারকে প্রথম দেখলেন, তখন জানতে চাইলেন;'কস্ত্বং?', যার উত্তরে নবকুমার বললেন, 'ব্রাহ্মণ'। একেবারে প্রথমেই নবকুমারকে ব্রাহ্মণ জেনেও কী ক'রে কাপালিক তাকে হত্যা করার কথা ভাবলেন এটাই অবাক করে। বঙ্কিম কি তাহলে মৃতদেহ নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না? নাকি তন্ত্রের একটা ভালগাড়াইজড রূপ দেখাতে চাইছিলেন ভদ্রলোক? কিন্তু যদি ভালগাড়াইজড রূপটাই দেখাতে চান তাহলে সমগ্র তন্ত্রকে ক্ষ্মপেরিশক্ষ্ম করার কথা কেন বলছেন কৃষ্ণমোহনকে? এই উপন্যাসে আর-এক জায়গায় আছে যে, কাপালিক এক ছিন্নমুণ্ড গলিত মৃতদেহের উপর বসে সাধনা করছিলেন। কিন্তু সে শব তো সুলক্ষণ যুক্ত নয়! মুণ্ডবিহীন ও গলিত মৃতদেহ তো তন্ত্রে পরিত্যাজ্য। মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্র হয়ে সহস্রার;এই সপ্তচক্রের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ না থাকলে শব সাধনা সম্ভব নয় বলে অনেকের অভিমত, যদিও অর্বাচীন গ্রন্থ ব্যতীত এর লিখিত কোনো প্রমাণ মেলে না সেভাবে। 'ভবচূড়ামণি'-তে বলা আছে, 'যষ্টিবিদ্ধং' অর্থাৎ লাঠির আঘাতে মৃত, 'শূলবিদ্ধং' অর্থাৎ শূলের আঘাতে বিদ্ধ হয়ে মৃত, এবং 'খড়গবিদ্ধং' অর্থাৎ খড়গাঘাতে মৃত মানুষ শব সাধনার ক্ষেত্রে গ্রহণীয়। এখন কথা হ'ল, যষ্টি, শূল এবং খড়গ;এই তিন প্রকার অস্ত্রের আঘাতের ধরণ তিনরকম। যষ্টির আঘাত সাধারণভাবে শরীর ভেদ করে না, যা শূলের আঘাত করে; আবার খড়গের আঘাত শুধু শরীর ভেদ করে না, তাকে ছিন্নও করে। তাছাড়া পলায়ন না ক'রে যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, তাঁর শবও সাধনার জন্য উত্তম। সেক্ষেত্রে শরীরের অঙ্গাদি ছিন্ন হবার সম্ভাবনা কি আদৌ উড়িয়ে দাওয়া যায়? যাইহোক, একটা বিষয় প্রাচীন ও অর্বাচীন, সব বইতেই আছে যে গলিত শব সাধন কার্যে মোটে বিহিত নয়।

'কপালকুণ্ডলা' পড়তে পড়তে আমার বার বার মনে হয়েছে, বঙ্কিম শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের দর্শনটা যতটা জানতেন, তার প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে ততটা জ্ঞাত ছিলেন না, যে কারণে আলোচ্য প্রমাদ দুটো ঘটেছিল। যাইহোক, ভুললে চলবে না, বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'কপালকুণ্ডলা' লিখছেন, তখন সমস্ত কিছুই তমসাবৃত, ফলে সব তথ্য তাঁর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে এটা ভাবা বাতুলতা। কিন্তু সেইসাথে আজ ভ্রান্তিগুলো প্রকাশ করারও প্রয়োজন আছে;কারণ মানুষের চেতনা তাকে সর্বদাই অজানাকে জানার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে, ফিরছে। সেটা বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকবে না।

বন্ধুতার পাতা

সংকলন ঃ
শুভেন্দু
দাশগুপ্ত

ধর্ম প্রীতির মিলন
রথের মেলায়।
গড়বেতার রায়তায়
স্থানীয় শাঁখারীদের
প্রতিনিধি হিসাবে
হাতি ঘোড়া রাখা হয়
রথে।

গুপ্তিপাড়ার রথ, সন্তান
দলই ও হেস্টিংস সাহেব,
অয়ন মুখোপাধ্যায়,
এই সময় ১২ জুলাই ২০২৫

নজরুল ইসলামের লেখা
উপন্যাস 'মৃত্যু ক্ষুধা',
মুক্ত মনের আনসারকে
ভালোবেসেছে ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে
রুবি। রুবির প্রেম অসুস্থ
আনসারকে জীবনের নতুন রূপ
দেখিয়েছিল।

গরুর গাড়ির গাড়োয়ান,
ঘোড়ার কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রি,
কুলি, মজুর, মেথর এই সব
হিন্দু মুসলমান শ্রমজীবীদের
নিয়ে ইউনিয়নে হুলুস্থুল বাধিয়ে
তোলে।
পুলিশ আনসারকে গ্রেপ্তার
করলে হিন্দু মুসলমান
শ্রমজীবীরা আনসারকে
উদ্ধার করতে ছুটলো
পুলিশের অত্যাচারকে
অগ্রাহ্য করেই। (অংশ)

শুভা রায়, বাংলা উপন্যাসে
শ্রমজীবী জীবন কথা।

কাজি নজরুল ইসলাম
হিন্দু দেব দেবীদের নিয়ে
অনেক গান লিখেছেন,
সুর দিয়েছেন।

(২)

১৯৪৬ এর তেভাগা আন্দোলন একটি অনবিরত কৃষক সংগ্রাম যা বিরাট তাৎপর্য লাভ করেছিল। আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টির আনুকূল্যে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র। সোমনাথ লাহিড়ী ও নৃপেন চক্রবর্তী একটু স্নেহ করতেন। তাঁদেরই আগ্রহে যাই রংপুরে তেভাগা আন্দোলন দেখতে। কৃষকরা দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে একদিন উপলব্ধি করে ফসলের ওপর তার অধিকার আধা নয়, তিনভাগের দুভাগ, জোতদার নেবে এক ভাগ, কাটা হলে ধান উঠবে চাষির খোলানে।
তেভাগা চাই-ই, জোতদারকে দুনিয়া থেকে বরবাদ কইরা দিমু। লাঞ্ছিত হিন্দু মুসলমান কৃষকের মর্মবাণী এই। খাদু বর্মন আর চৌগরু মহম্মদের ছড়াছড়ি এইখানে।

সোমনাথ হোরের এই ডায়েরির লেখায়, আঁকায় এসেছে আন্দোলনে থাকা হিন্দু ও মুসলমান চাষিদের নাম ও ছবি, যারা একসাথে লড়াই করেছে তেভাগা আন্দোলনে, হরিকান্ত সরকার, শাকরুদ্দিন, কালাচাঁদ, চাটি মহম্মদ, দীন দয়াল, টোকু মহম্মদ, লখিয়া বর্মন, জামশেদ আলি, বাবুরি বর্মন। (অংশ)

সোমনাথ হোর, তেভাগার ডায়েরি ও চা বাগিচার কড়চা, সুবর্ণরেখা, ২০১০.

বাদশাহ আকবরের শাসনকাল ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ।
বৃন্দাবনের মদনমোহন মন্দির থেকে পাওয়া আকবরের একটি ফরমান (১৫৯৮)-এ রয়েছে কতকগুলি তথ্য।

৬

এই পরওয়ানাটিতে
মদন মোহন মন্দিরকে
১২০ বিঘা এবং
গোবিন্দ দেব মন্দিরকে
৭০ বিঘা জমি দান
করার কথা আছে।
দুটি মন্দিরই চৈতন্য
সম্প্রদায়ের।
এই ফরমানটির তথ্য
অনুযায়ী মথুরা বৃন্দাবনের
৩৫ টি মন্দিরকে জমি
দেওয়া হয়। মন্দির, যুগল
নন্দ নন্দন মন্দির, যুগল
কিশোর মন্দির, বিহারী
জি মন্দির, ধারু মন্দির।
এগুলি ছাড়াও চতুর্ভুজ,
সাক্ষী, সাকেত, রাধাকুণ্ড,
বরখানপুর, গোবর্ধন,
সাংকি, খের বল্লভ জি
এই সব মন্দির ও ধর্মস্থানকে
আকবর নানাভাবে সাহায্য
করেন।
আকবরের নীতি ছিল ধর্মীয়,
এটি আকবরের মধ্যযুগীয়
ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি।

কনিষ্ক চৌধুরী, একটি বৈষ্ণবতীর্থের
জন্মকথা বা মুঘল বাদশাহদের
অনন্ত অবদান, নাগরিক
ও গণতান্ত্রিক অধিকার, জুলাই (বাংলা)
আগস্ট ২০২৬

পার্ক সার্কাস - তিলজলা
এলাকা যুক্ত গোবিন্দ খটিক
রোড। ৭০০ ০৪৬। কলকাতার
দরিদ্রতম অঞ্চলগুলির
অন্যতম। যেখানে হিন্দু
বাঙালি, বিহারী ও
উত্তর প্রদেশের মুসলমান,
বিহারী যাদব, কয়েকঘর
বরাকুরিতে খ্রিষ্টান, দরিদ্র,
নিম্নবিত্ত মানুষের কাছাকাছি,
ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থান।
(সেখানে) গোবরা এক নম্বর
কবর স্থান। শবদেহ কবরে
নামানোর পর শবযাত্রীরা
গেটের বাইরে চায়ের
দোকানে জটলা বাঁধে।
আচ্ছি কাপড় হাতে চা
এগিয়ে দেয়, সঙ্গে কখনও
মুড়কি বিস্কুট।
অপরিসর নোংরা রাস্তা
প্রায় কখনওই ঝিমিয়ে
থাকত না, হয় কাওয়ালি,
নয় কেত্তন, নয়
ঢোল বাজিয়ে রামনাম

৪

কীর্তন লেগেই থাকতো।
সবচেয়ে সাজানো হতো
ক্রিসমাসের সময় — চারিদিক
রঙীন কাগজের শিকল, রাংতার
ফুল আর তারা দিয়ে সাজানো
দুটো গোটা রাস্তা, রেল লাইনের
ধার ঘেঁষে খড় দিয়ে তৈরি
নকল আস্তাবল — তার মধ্যে
একেকটা স্কুলের স্টাইলে যিশুর
উপাখ্যান, উৎসবের মেজাজে
জমিয়ে দিতে মাইকে গান
বাজানো হতো, খ্রিষ্টান ছেলেদের
পাশাপাশি মুসলমান ছেলেদেরও
গানের তালে নাচতে দেখেছি।

আন্ড্রু বাগানের অপরিচ্ছন্ন বস্তি
পরিবেশের একটা দুর্নাম ছিল।
দাঙ্গা না করার সুনাম।

দেশের সাম্প্রদায়িকতা রোধে
ঠাকুরমার প্রেসক্রিপশন ছিল
সবাইকে পাত পাইড়া খাইতে
দাও.. দেখবা হানাহানি
মিট্যা গ্যাছে গিয়া। আমাদের
বাড়ির সব মুসলমান এতিম অতিথি
ঠাকুরমার রান্না ঘরে ঢুকে ওই
তারাই পিঁড়ি পেতে খেত..

ঠাকুরমার কড়া
নির্দেশ ছিল কেউ
যেন এঁটো কুড়িয়ে
পাত না তোলে।
তাতে গৃহস্থের মান
থাকে না।
আন্ড্রু বাগানের
জামশেদ ভাই মেডিক্যাল
কলেজে আমার
থেকে সিনিয়র ক্লাস মেট
ছিল, পরীক্ষার আগে
রোজই আমাদের
বাড়ি পড়তে আসতো,
ঠাকুরমার রান্নাঘরেই
খাওয়া দাওয়া সারতো।
ঠাকুমাকে মা বলেই
ডাকতো।
বকরি ঈদের দিন
মাংস ওয়ালা সেরা
রানটি ওদের
বাড়ি থেকে আমাদের
বাড়িতে সিল্কের রুমালে
মুড়ে পাঠানো হতো।
(শেষ)

ঊর্বী মুখোপাধ্যায়,
কলকাতা [illegible]
[illegible] ২০১৯